# রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট (১৯৪৩-৬৫)

গণনাট্য সংঘের নাটকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও

তৃতীয় অধ্যায়

গণনাট্য সংঘের প্রথম ম্যানিফেস্টোর উদ্দেশ্য ছিল কৃষক-শ্রমিকের রাজনৈতিক চেতনা ও সংগ্রামকে ব্যবহার করে বাংলা নাট্যশিল্পকে সমাজবদলের চালিকাশক্তি করে তোলা। গণনাট্য সংঘ শিল্পকলার মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক দাবি পূরণ এবং একটি জনগণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করার জন্য লড়াই করেছিল। এই অধ্যায়ে আমরা ১৯৪৩-৬৫ এই সময়কালে গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত নাটকগুলিতে কীভাবে বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ উঠে এসেছে, সেই বিষয়ে আলোচনা করব। অধ্যায়টিকে আমরা পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ : দুর্ভিক্ষ, খাদ্যসংকট, খাদ্য আন্দোলন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সাম্প্রদায়িকতা, দেশভাগ, উদ্বাস্ত পরিস্থিতি এবং গণনাট্য সংঘের নাটক তৃতীয় পরিচ্ছেদ : রাষ্ট্র, রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক চতুর্থ পরিচ্ছেদ : গণনাট্য সংঘের নাটকে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : গণনাট্য সংঘের নাটকে অন্যান্য প্রসঙ্গ

অধ্যায়ের শেষে আমরা প্রতিটি পরিচ্ছেদে আলোচিত ও উল্লেখিত নাটকগুলির একটি তালিকা প্রদান করেছি।

# প্রথম পরিচ্ছেদ

# দুর্ভিক্ষ, খাদ্যসংকট, খাদ্য আন্দোলন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক

১৭৭০ সালে ইংরেজ প্রবর্তিত দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা দ্বারা সৃষ্ট 'ছিয়াত্তরের মম্বন্তর'-এ অসহায় বাঙালি জাতির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা অবলীলায় মুছে গিয়েছিল। তারপর থেকে খাদ্যসংকট ও দুর্ভিক্ষ হয়ে উঠেছিল বাঙালির ঘরকন্নার সঙ্গী। সমগ্র ঊনবিংশ শতক জুড়ে বাংলার পথে-প্রান্তরে, খেত-খামারে খাদ্যসংকটের তীব্রতা দমকা বাতাসের মতো বারবার তার উপস্থিতি জানিয়ে গেছে। এ-দেশ শাসন করতে এসে ইংরেজ নিয়ে এসেছিল মম্বন্তর, বিদায়ের পূর্বেও সে বাঙালিকে উপহার দিয়ে গেল আরেকটি মম্বন্তর। ১৯৪৩ খ্রি বা ১৩৫০ বঙ্গাব্দের সেই মম্বন্তরের রূপ ছিল আরও নৃশংস, আরও ভয়ানক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আন্তর্জাতিক রাজনীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সরকারি আমলাতন্ত্র, চোরাকারবারিদের বহুমুখী আক্রমণে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' বাংলায় পৈশাচিক মৃত্যুদূতের মতো হাজির হয়েছিল। গ্রাম-বাংলার বুকে বিরাজমান শ্মশানের নীরবতা কিংবা শহরের ফুটপাথে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুযের চিৎকার আজও আমাদের দুঃস্বপ্নে হানা দিয়ে যায়। কোনো পূর্ব ভূমিকা ছাড়াই ৫০ লক্ষ ভূমিহীন, জাতহীন, ধর্মহীন মানুষ শুধু ক্ষুধার্তের পরিচয় নিয়ে হাড়গিলে পাথির খাদ্য হয়ে গেল।

#### মম্বন্তরের কারণ :

১৯৩৯ সালে শুরু হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 'ফ্যাসিস্ট' ইতালি-জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ইংরেজ ভারতবর্ষকে যুদ্ধসামগ্রী সরবরাহের ঘাঁটি হিসেবেই দেখেছিল। ১৯৪২ সালে অক্ষশক্তির জাপান

ভারতের পূর্বপ্রান্তে বার্মা দখল করে নিলে ভীত ইংরেজ সরকার 'ডিনায়াল পলিসি' চালু করে। জাপানিরা ভারতে প্রবেশ করলে যাতে পর্যাপ্ত খাদ্য না পায়, সেই কারণে শুরু হয় 'চাল বর্জন' প্রকল্প । এই সুযোগ গ্রহণ করে কালোবাজারি ব্যবসায়ীরা কৃষকদের থেকে স্বল্প দামে ফসল কিনে মজুতদারি শুরু করে। জাপানকে রোধ করার জন্য বাংলায় আগত ব্রিটিশ-আমেরিকান সৈনিকদের রসদের জন্য সেই ফসল চড়া দামে বিক্রি শুরু হয়। একইভাবে জলপথে জাপ-আক্রমণ রোধ করার জন্য চালু হয় 'নৌকা বর্জন' প্রকল্প । চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, খুলনা, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণার নদীকেন্দ্রিক অঞ্চলগুলি থেকে রীতিমতো তালিকা তৈরি করে নৌকা ধ্বংস করে দেওয়া হয়।<sup>2</sup> এই সকল অঞ্চলের চাষিরা ফসল বহন করার জন্য মূলত নৌকার উপরেই নির্ভরশীল ছিলেন। বার্মা জাপানিদের হাতে চলে যাওয়ায় রেঙ্গুন থেকে আগত চালের আমদানিও বন্ধ হয়ে যায়। ফলত গ্রামবাংলার বিস্তীর্ণ অংশের মানুষের জীবনে অনাহার নেমে আসে।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৪২-এর অক্টোবর মাসে মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণায় বিধ্বংসী ঝড়ে প্রবল ক্ষয়ক্ষতি হয়। পঞ্চাশ শতাংশ শস্য নষ্ট হয়ে যায় ও ৭০,০০০ গবাদি পশু মারা যায়। শুধুমাত্র তমলুক মহকুমাতেই মারা যান ৪০০০ মানুষ<sup>1</sup> সোহরাবর্দি সরকার খাদ্যসংকট নিয়ে যে ১১টি যুক্তি তুলে ধরেছিল তার মধ্যে চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুরের ঝড়ের ফলে ফসল নষ্ট হওয়া ছিল অন্যতম। তাদের আরও দুটি যুক্তি ছিল আউস ও আমন ধানের অভাব।<sup>°</sup> ঝড়ে প্রায় ১১ কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়েছিল এ-কথা সত্য। ৯০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজনের জায়গায় ১৯৪৩ সালে ৬৯ লক্ষ টন শস্য উৎপাদিত হয়েছিল। কিন্তু ফেমিন এনকোয়ারি কমিশনের রিপোর্টে জানা যাচ্ছে যে ১৯৪২-র আমন ধান ও ১৯৪৩-র আউশ ধান মিলিয়ে প্রায় ৪২ সপ্তাহের উপযোগী খাদ্য ছিল।<sup>8</sup> স্পষ্টতই প্রাকৃতিক কারণ দুর্ভিক্ষের মূল উৎস ছিল না।

সোহরাবর্দি সরকার যে কারণটা তৎকালে দেখায়নি, তা হল কালোবাজারি-মজুতদারি। কালোবাজারি ব্যবসায়ী, ব্রিটিশ সরকারের অমানবিক আচরণ, সোহরাবর্দির মুসলিম লিগ সরকারের স্বার্থাম্বেম্বী আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি বাংলার বুকে দুর্ভিক্ষ নিয়ে এসেছিল। পাশাপাশি ১৯৪২-৪৩ সালে বাংলা যখন ধুঁকছে তখন বিদেশে খাদ্যশস্য রপ্তানি করা হয়েছে ৩,৭৯,১৭০ টন, আর আমদানি মাত্র

১৮,৫৪১ টন<sup>1৫</sup> মানুষের জীবন নিয়ে ইংরেজের ছিনিমিনি খেলায় যোগ্য দোসর হয়ে উঠেছিল কালোবাজারি মজুতদাররা। 'চাল বর্জন' নীতির সময়কালে চাল কেনার জন্য সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত না হয়ে কয়েকজন এজেন্টের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেয়। গ্রাম থেকে তিন টাকা মণ দরে চাল কিনে গুদামজাত করে কলকাতায় পনের টাকা মণ দরে চাল বিক্রি করতেও এরা পিছ-পা হয়নি। এদের অধীনেই গড়ে উঠেছিল বেসরকারি দালাল চক্র। পরবর্তীকালে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন যে দুর্ভিক্ষ খাদ্যাভাবের ফলে হয়নি, দুর্ভিক্ষ হয়েছে খাদ্যে মানুষের অধিকার না থাকায়।

১৯৪২-৪৩ সময়কালে খোলাবাজারে ক্রমবর্ধমান চালের দরের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে যাবে চোরাবাজারিদের দৌরাত্ম্য কোন পর্যায়ে পোঁছেছিল। ১৯৪১ সালের জুন মাসে চালের দাম ছিল মন প্রতি ৮ টাকা। কিন্তু ১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসে তা ৩৭ টাকায় পোঁছোয়।<sup>৭</sup> এই সময়ে বাংলা প্রদেশে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত মুসলিম লিগ সরকার ও তার প্রধানমন্ত্রী সোহরাবর্দি কী করছিলেন? আগস্ট আন্দোলনের কারণে জেলবন্দি কংগ্রেসের অনুপস্থিতির সুযোগে মুসলিম লিগ পাকিস্তান প্রস্তাবক আরও দৃঢ় করার কাজে ব্যস্ত ছিল। ফলে এই সকল ব্যবসায়ী ও এজেন্টদের হাতে রাখার দায় তার ছিল। ইংরেজ সরকারের অনুরণনে প্রথমে 'দুর্ভিক্ষ' শব্দটিকেই নাকচ করে দিয়ে আত্মপ্রসাদ ভোগ করেছিল সোহরাবর্দি সরকার। অথচ ফেমিন কোডে দুর্ভিক্ষের লক্ষণ রূপে স্পষ্ট বলা আছে— "১) খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, ২) খাদ্যশস্য ব্যবসায় অতিরিক্ত চাঞ্চল্য, ৩) লোকের স্থান ত্যাগের আধিক্য, ৪) অস্বাভাবিকভাবে জনতার ইতন্ততঃ ঘোরাফেরা, ৫) ভিক্ষার অভাবে স্থানীয় ভিক্ষুকদের দূর দূরান্তরে গমন।"<sup>৮</sup> এই সময়ে দাঁড়িয়ে বাংলার খাদ্য সচিব জনসাধারণকে চালের বদলে জোয়ার-বাজরা সহযোগে অল্প নুন দিয়ে ফ্যান খাওয়ার পরামর্শ দেন।<sup>৯</sup>

১৯৪৩-এর আগস্টে পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠলে সরকার কন্ট্রোল প্রথার মাধ্যমে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাল আইনত বাজেয়াপ্ত করে 'কন্ট্রোলের দোকান'-এর মাধ্যমে বন্টনের ঘোষণা করে। কিন্তু সরকার চোরাকারবারিদের বিরুদ্ধে শুধু মৌখিক হুমকি ছাড়া কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। ১৯৪৩ সালের আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তিনবার মূল্য নিয়ন্ত্রণ চালু করা হয়। প্রথমে কৃষকদের ধান বিক্রয় মূল্য সর্বোচ্চ মন প্রতি ১৫ টাকা ও পাইকারিদের চাল বিক্রয় মূল্য সর্বোচ্চ

৩০ টাকা বেঁধে দেওয়া হলেও, শেষে যথাক্রমে ১০ টাকা ও ২০ টাকায় নেমে আসে।<sup>১০</sup> কিন্তু কৃষকদের থেকে প্রথমে চাল-বর্জনের সময়, পরে এজেন্টদের মাধ্যমে প্রায় জোরপূর্বক কম দামে চাল কিনে গুদোমজাত করা হয়েছে। আউশ, আমন ধান রোপন করে সেই কৃষক আজ শহরের লঙ্গরখানায় গ্রুয়েল নামক এক অত্থাদ্যের জন্য ভিক্ষারত। গ্রামবাংলার মৃতপ্রায় মানুষদের মূল চাহিদা তথন অর্থ নয়, অন্ন। মূল্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকা দুর্নীতিগ্রস্থ আমলাতন্ত্রের বদান্যতায় চাল পাইকারি বাজার থেকেও উধাও হতে শুরু করেছে। রেশনিং-এর ব্যবস্থাও ছিল শুধুমাত্র কলকাতার হদস্পন্দনকে সচল রাত্মার জন্য। ফলে সামান্য ফ্যানের আশায় কলকাতা শহরে নিরন্ন মানুষের মিছিল অব্যাহত রইল।

#### দুর্ভিক্ষের ফল :

শাসক-শোষকের চক্রান্তের ফলে ধানের দেশের লোক আজ নিরন্ন। খাদ্যের অভাবে ধুঁকতে ধুঁকতে গ্রামগুলি পরিণত হল শ্মশানে। গ্রামের মানুষ নিঃস্ব-নিরাশ্রয় হয়ে শহরের অনিশ্চিত পথে পা বাড়াল সামান্য ফ্যানের আশায়। কিংবা শহরের ফুটপাথে কঙ্কালসার দেহ নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায়। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে দেখা যায় কলকাতায় আগত বুভুক্ষুদের মধ্যে শতকরা ৪৭ জন ক্ষেতমজুর, ২৫ জন মধ্যবিত্ত কৃষক, ৭ জন ছোটো ব্যবসায়ী, ৭ জন ভিক্ষুক, ৩ জন মৎস্যজীবী ও অন্যান্য ১০ জন।<sup>১১</sup> সরকারি মতে ১৯৪৩-র সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলকাতায় আগত নিরন্ন মানুষের সংখ্যা ৮০০০০, যদিও বেসরকারি ভাবে সংখ্যাটা ১২৫০০০ জন।<sup>১২</sup> আগস্টের শেষ দু-সপ্তাহে সরকারিভাবে কলকাতায় মৃত্যু সংখ্যা ছিল ৫৪৮ জন।<sup>১৩</sup> কিন্তু 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় অক্টোবরের শেষের রিপোর্টে দেখা যায় যে গত তিনমাসে মৃত্যু সংখ্যা ৭৯৬৪ জন।<sup>১৪</sup> সরকার প্রদত্ত তথ্যে কারচুপি রয়েছে এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কলকাতা শহরেই যখন এই অবস্থা তখন মফস্বল অঞ্চল ও গ্রামের পরিণতি ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

দুঃসময় কখনও একা আসে না। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণ করেছিল ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা, শোথ প্রভৃতি রোগ। সরকারি উদাসীনতা ও পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাবে যা ক্রমে মহামারির আকার নেয়। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার হিসেবে ১৯৪৩-এর নভেম্বরে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৪০০০০ মানুষ মারা গেছে। বেশ কয়েকটি জেলা শ্মশানে পরিণত হয়েছে। যদিও দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছিল বাংলায় মৃত্যুর সংখ্যা ১৫ লক্ষ। কিন্তু পরবর্তীকালে অমর্ত্য সেনসহ অনেক গবেষকই মনে করেন দুর্ভিক্ষে প্রায় ৩৫-৪০ লক্ষ মানুষ মারা গেছেন।<sup>১৫</sup> শুধু মৃত্যুসংখ্যা নয়, দুর্ভিক্ষের আঘাতে ৬৫ লক্ষ মানুষ সম্পূর্ণ নিরাশ্রায় হয়ে পড়েছিলেন। যার মধ্যে ছিলেন ৬ লক্ষ মধ্যবিত্ত চাষি, ১৫ লক্ষ তাঁতি, ৪ লক্ষ জেলে, ২৭ লক্ষ খেতমজুর। ১২-১৩ লক্ষ মানুষ অচল ও পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন। বাংলায় প্রায় ১০ লক্ষেরও বেশি ঘরবাড়ি জনশূন্য অবস্থায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।<sup>১৬</sup> এদের কথা দুর্ভিক্ষের ক্ষয়ক্ষতির বিচারে ধরার ভাবনা সরকার চিন্তাও করে দেখেনি।

তথ্য-পরিসংখ্যানের বাইরেও দুর্ভিক্ষ মানবজীবনের এক চূড়ান্ত মর্মান্তিক দিক নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল। দুর্ভিক্ষ প্রায় এক কোটি মানুমের 'মানুম' পরিচয়টাই কেড়ে নিয়েছিল। সরকারের কাছে তারা শুধুই বুভুক্ষু মানুমের সংখ্যা। শহরের রাস্তায় ডাঁই করে রাখা মৃতদেহ চিল-শকুনের খাদ্যে পর্যবসিত হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ চোখে শুধুই জ্বলন্ত খিদে; পরিবার নেই, প্রেম নেই, মনুয্যত্ব নেই। আস্তাকুঁড় আর নর্দমার খাবার নিয়ে চলছিল কুকুরে-মানুমে লড়াই। কন্ধালসার মায়ের শুকনো বুকের থেকে শেষ জীবনরসটুকু নিংড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল মৃত সন্তান। কোথাও হয়তো বাবা-মা ৫-১০ টাকায় সন্তানকে বিক্রি করে দিয়েছিল। কৃষকের ফসল ফলানো হাতদুটি ভিক্ষান্নের জন্য সম্প্রসারিত। যে নারী কোনোদিন জনসমক্ষে আসেনি, সেই নারী আজ সামান্য খাদ্যের আশায় নিরাসক্ত চোখে লাল আলোর তলায় এসে দাঁড়াচ্ছে। যে শিশুর জন্য পাঠশালার নামতা পাঠের সুর বরাদ্দ হওয়া উচিত ছিল, তার গলায় আজ ফ্যানের জন্য অক্ষুট আর্ত চিৎকার। মধ্যবিত্ত পরিবারেরও রেহাই ছিল না দুর্ভিক্ষ থেকে।

দুর্ভিক্ষগ্রস্ত জীবনশক্তিহীন মানুষ যেমন জীবনের সঙ্গে লড়ছিলেন, তেমনই আরেকটা লড়াই চালানোর চেষ্টায় রত ছিলেন বাংলার সচেতন বিবেকবান মানুষ। চূড়ান্ত খাদ্যাভাবের দিনে যাদের দু-

মুঠো অন্নের সংস্থান ছিল, তাদের একটা অংশ সীমিত সামর্থ্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে। বিভিন্ন বেসরকারি রিলিফ প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের পক্ষ থেকে বুভুক্ষ মানুষের অন্নসংস্থানের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। সরকারি অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বেশ কিছু সংবাদপত্র ও পত্রিকা সেদিন সত্য প্রকাশের পথ থেকে সরে আসেনি। শিল্পী-সাহিত্যিকদের কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, ছবিতে সেদিনের দুর্ভিক্ষের যে চিত্র উঠে এসেছিল তা সমকালের মানুষকে সচেতন এবং উত্তরকালের মানুষকে সাবধান করে দিয়ে গেছে।

# পঞ্চাশের মম্বন্তর ও গণনাট্য সংঘের নাটক :

চল্লিশের দশক বাংলা পেশাদার থিয়েটার যে পৌনঃপুনিকতায় ভুগছিল তার পক্ষে দুর্ভিক্ষের বিরাট সংকটকে বাংলা নাট্যমঞ্চে তুলে আনা সম্ভব হয়নি। এই সময়ে পেশাদার থিয়েটারগুলি যুদ্ধ ও অন্যান্য কারণে এমনিই ধুঁকছিল, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কারণ ছিল মানবিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা। দুর্ভিক্ষের কালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের দৃপ্ত আবির্ভাব বাংলার সাংস্কৃতিক চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। প্রাথমিক ভাবে গণনাট্য সংঘের কাজ ছিল পিপল রিলিফ কমিটির জন্য ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের হয়ে অর্থ সংগ্রহ করা। গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত বিজন ভট্টাচার্যের লেখা 'আগুন', 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' নাটক মন্বন্তরের বিভীষিকার চিহ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। গণনাট্য সংঘের আন্যতম স্থপতি বিজন ভট্টাচার্যের শিল্পীসত্ত্বাকে মন্বন্তর কীভাবে নাড়া দিয়েছিল সে বিষয়ে তিনি লিখেছেন.

"বিয়াল্লিশের আন্দোলন ও তেতাল্লিশের মম্বন্তর আমাকে নাড়া দিয়েছিল। ক্ষুধিতদের ট্রাজেডির উৎস ও গভীরতা প্রকাশের ক্ষমতা আমার ছিল না। শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, ওরাই যদি ওদের কথা বলতে শুরু করে, ওরা নিজেরাই সামনে এসে দাঁড়ায়। ওরা কেমন করে কথা বলে, কেমন করে হাসে, কেমন করে জানে, বোধ করে, আমার জানা ছিল। তাই

নিয়ে যদি কিছু করি তাহলেই কিছু করা যেতে পারে। সেই চেষ্টাতেই প্রথমে 'আগুন', তারপর 'জবানবন্দী' এবং 'জবানবন্দী'র 'সাকসেস' হওয়াতেই লিখলাম 'নবান্ন'।"<sup>১৭</sup>

#### আগুন :

পাঁচটি দৃশ্যে বিভক্ত 'আগুন' নাটকে বিজন ভট্টাচার্য বাংলায় তেতাল্লিশের মম্বন্তর কেন্দ্রিক খাদ্যসংকটের চিত্র এঁকেছেন। প্রথম দৃশ্যে মানুষ চালের লাইনে দাঁড়ানোর নিত্য-সংগ্রামের প্রস্তুতিতে ব্যন্ত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্যে কৃষক-শ্রমিকের জীবনও এই খাদ্যাভাবের চক্রব্যুহতে জড়িয়ে পড়ে। চতুর্থ দৃশ্যে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের দীর্ঘ 'নেই'-এর তালিকা। আমরা জানতে পারি কীভাবে যুদ্ধের উদগ্র ক্ষুধাকে ব্যবহার করে চোরাবাজারির বাড়বাড়ন্ত মানুষকে নীরব মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পঞ্চম দৃশ্যে এই সমস্ত মানুষ রেশনের চালের লাইনে এসে দাঁড়ায়। তারা বুঝতে পারে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ ক্ষুধা নামক একটি পুতুল খেলার দড়িতে বাঁধা। যদিও নাটকটিতে খাদ্যসংকটের রাজনীতিকে ধরার চেষ্টা করা হয়নি। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের মানুষের দুর্দশার চিত্র আঁকতে গিয়ে কার্যকারণ সূত্রও ক্ষুপ্প হয়েছে। বিজন ভট্টাচার্য শুধু সেদিনের সংকটকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

#### জবানবন্দী :

'আগুন'-এর পরবর্তী প্রযোজনা 'জবানবন্দী'-তে উঠে এল মম্বন্তরক্লিষ্ট গ্রামবাংলার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। নিথর নিস্পন্দ গ্রামে মৃত্যুর ছায়া খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাদের থেকে বেঁচে থাকার আশাটুকুও কেড়ে নিয়েছে। তাই ঈশ্বরের প্রতি ভরসা রাখতেও আজ বেন্দার অনীহা। সন্তানকে 'ক্ষুধা' নামক এক দুরারোগ্য ব্যাধির থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়। বাধ্য হয়ে বৃদ্ধ কৃষক পরান মণ্ডল সপরিবারে শহরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা আশা করে শহরের ফুটপাথে 'বাবুদের'

ভিক্ষান্নে অন্তত প্রাণটুকু বাঁচবে। যে হাতে পরান মণ্ডল একদিন লাঙলের আঁচড়ে ফসল ফলিয়েছে, যে হাতে নবান্নের উৎসবে ঈশ্বরকে ধান সমর্পণ করেছে; আজ সেই হাত দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে ভিক্ষান্নের জন্য সম্প্রসারিত। ঘটনাটি যেন হুবহু মিলে যায় সোমনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে জনৈক দুর্ভিক্ষগ্রস্ত কৃষকের কথোপকথনের সঙ্গে,

''আমি জিজ্ঞেস করি, 'লঙ্গরখানায় যাও না কেন?'

'বড্ড ঠেলাঠেলি। তাছাড়া একটা আধটা পয়সা ভিক্ষে করা যায়, কিন্তু রান্না করা খাবার ভিক্ষে করি কী করে? আমরা তো সৎ চাষি, ভিখিরি নই, বলন?...

জনমজুর চাষি আজ ভিখিরিতে পরিণত হচ্ছে, তবু সে তার আত্মর্যাদা ভোলে না। সে এখনও উৎপাদক।..."<sup>>৮</sup>

কিন্তু তারপর? দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির গৌরবকে মুছে দিয়েছিল, বদলে দিয়েছিল মানুষকে। ক্ষুধা স্নেহ-প্রেমের বাঁধন ছিঁড়ে মানুষকে পশুতে রূপান্তরিত করেছিল। তাই নাটকে বেন্দার মা ক্ষুধার্ত নাতির মুখে খাবার তুলে না দিয়ে গোগ্রাসে খিচুড়ির হাড়িটা নিঃশেষ করে ফেলে। অনুরূপ একটি ঘটনার বিবরণ আমরা তৃপ্তি মিত্রের জবানিতেও পাই,

"...ছেলেপিলেগুলো দৌড়ে এসেছে, কী ভীষণভাবে তাঁদের তাড়াল মা, একে চড় মেরে ওকে চড় মেরে তাড়িয়ে ফ্যানটা খেতে লাগল।"<sup>১৯</sup>

বেন্দার বৌ তার হাড়গিলে শরীর বিক্রি করেছে দু-মুঠো খাদ্যের আশায়। কিন্তু শেষরক্ষা হয় না। অনন্ত ক্ষুধা আর অব্যক্ত অভিশাপ নিয়ে বেন্দার সন্তান মানিক মারা যায়। মৃতদেহ তুলে নিতে আসা এআরপি যুবকের কাছে 'মানিক' কারোর সন্তান নয়, শুধু লাশের একটা নাম। যত তাড়াতাড়ি সেই নাম মুছে ফেলা সম্ভব, ততই সরকারের মঙ্গল। ঘর, জমি, লাঙল, ধানখেতের স্বপ্নে বুঁদ পরান মণ্ডলেরও মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। মৃত্যুর আগে তার দু-চোখে ক্ষেতভরা সোনালি ধানের স্বপ্ন,

"তোরা সব ঘরে ফিরে যা। আমার-আমার সেই মরচে পড়া নাঙ্গল ক'খানা আবার শক্ত করে চেপে ধরগে মাটিতে।... সোনা, বেন্দা, সোনা ফলবে, ফিরে যা। ফিরে যা..."<sup>২০</sup>

চারটি দৃশ্যের নাটকটির প্রতিটি দৃশ্য শুধুই চলমান বিপর্যয়ের মর্মান্তিক প্রতিচ্ছবি। জনশূন্য গ্রাম, অমানবিক শহরে ফ্যানের জন্য আর্ত চিৎকার, মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ আর সবশেষে একটা দুর্দমনীয় স্বপ্ন—এটুকুই নাট্যকাহিনির সম্বল। এটুকু দেখানোই নাটককারের উদ্দেশ্য। তাই 'জবানবন্দী'-তে প্রথাগত নাটকের অনেক বৈশিষ্ট্যই অনুপস্থিত। নাট্যদ্বন্দ্ব নেই, নাট্যস্থানের একতা নেই, কাহিনির ধারাবাহিক বিস্তার নেই, চরিত্রচিত্রণেও পারস্পর্য নেই। কিন্তু তার সঙ্গে মানুষকে ভুলিয়ে রাখার কোনো ছলনাও নেই। আছে শুধু দুর্ভিক্ষের সকরুণ সুরের দীর্ঘ আলাপ। আছে পরাণ মণ্ডলের অপূর্ণ স্বপ্নের বীজধান ছড়ানোর আত্মবিশ্বাস। তাই 'জবানবন্দী' হয়ে ওঠে গণনাট্য সংঘের কণ্ঠে উচ্চারিত প্রতিজ্ঞাকঠিন হাতে শোকাশ্রু মুছে ঘরে ঘরে নবান্ন পাঠানোর আহ্বান; 'ফুল নিয়ে বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে' লড়ার প্রথম দলিল।

#### নবান্ন :

বিজন ভট্টাচার্যের লেখা 'নবান্ন' নাটকটি ১৯৪৪ সালের ২৪ অক্টোবর প্রথম মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি প্রযোজিত হওয়া মাত্রই বাংলা নাট্যমহলে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। 'জবানবন্দী'র পর 'নবান্ন' হয়ে ওঠে মহামারি শেষে জন্ম নেওয়া প্রথম ধানের শিষ। 'জবানবন্দী' নাটকের মাথাল গ্রামের পরান মণ্ডল যেন জাতিস্মর হয়ে প্রধান রূপে ফিরে আসে আমিনপুর গ্রামে। পরানের মতোই শহরে ভিক্ষের আশায় গিয়েছিল 'নবান্ন' নাটকের প্রধান, নিরঞ্জন, দয়াল, রাধিকা, কুঞ্জরা। কিন্তু শত বাধা পার করে তারা ফিরে আসে তাদের গ্রামে। 'জবানবন্দী'র একক ব্যক্তির অপূর্ণ স্বপ্লের ট্রাজেডিকে তারা অসংখ্য শক্ত হাতে সরিয়ে মেতে ওঠে 'নবান্ন' উৎসবে। এই স্বপ্লের বুনিয়াদ বিজন ভট্টাচার্য পেয়েছিলেন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে কাছে। তিনি বলছেন,

"ডি এন মিত্র স্কোয়ারের পাশ দিয়ে রোজ আপিস যাই। রোজই দেখি, গ্রামের বুভুক্ষু মানুষের সংসারযাত্রা। নারীপুরুষ শিশুর সংসার। এক একদিন একটা মৃতদেহ, নোংরা কাপড়ে ঢাকা। মৃতদেহগুলো যেন জীবিত মানুষের চেয়ে অনেক ছোটো দেখায়।... একদিন ফেরবার পথে কানে এল, পার্কের রেলিং-এর ধারে বসে এক পুরুষ আর এক নারী তাদের ছেড়ে আসা গ্রামের গল্প করছে, নবান্নের গল্প, পুজোপার্বণের গল্প, ভাববার চেষ্টা করছে, তাদের অবর্তমানে গ্রামে তখন কী হচ্ছে। আমি আমার ফর্ম পেয়ে গেলাম।"<sup>২১</sup>

দুর্ভিক্ষের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটকে নাটকে তুলে ধরার জন্য তিনি একটি বড়ো ক্যানভাসের সাহায্য নেন। নাটকের শুরুতেই আগস্ট আন্দোলনকে ধ্বংস করতে আমিনপুর গ্রামে ব্রিটিশ সরকারের নৃশংস সন্ত্রাস নেমে আসে। মহিলাদের সম্মান ভূলষ্ঠিত হয়, পুলিশের গুলিতে প্রধানের দুই সন্তান প্রাণ যায়। এদিকে মম্বন্তরের করাল গ্রাসে ধুঁকছে গোটা গ্রাম। প্রধান সমাদ্দারের পরিবারও সেই নিয়তির শিকার। পেতলের বাসন বেচে চাল নিয়ে এসেছে কুঞ্জ। তারপরই প্রলয়ংকরী এক ঝড়ে প্রধানের ঘর তেঙে যায়। আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না নাটকের আমিনপুর বাস্তবের মেদিনীপুর জেলা। প্রধানের জীর্ণ ঘরে 'অনাহার' নামের একটা মারণ রোগ কেড়ে নেয় তার নাতি মাখনকে। প্রধান তার শেষ জমিটুকু জোতদার হারু দত্তের হাতে তুলে দিয়ে পাড়ি জমায় শহরের পথে। অসংখ্য দৃশ্যের কোলাজের মাধ্যমে নাটককার প্রথম অঙ্কে দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রাম বাংলার একটি 'এপিক' দৃশ্যপট তৈরি করেন।

দ্বিতীয় অক্ষে কালীধন খাঁড়া, হারু দত্তদের মতো জোতদারদের সংলাপে আঁচ পাওয়া যায়, কীভাবে তারা যুদ্ধকে কাজে লাগিয়ে কালোবাজারির জন্য দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছে। সরকারি মূল্যনিয়ন্ত্রণকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কালীধনের মতো মজুতদার হারু দত্তের থেকে সাড়ে বাইশ টাকা মন দরে চাল কিনে পঞ্চাশ টাকা দরে বিক্রি করছে। দুর্ভিক্ষের যে কারণ আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি, তা নাটকেবাস্তব হয়ে ওঠে। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক রচনার অন্যতম কারণও ছিল চোরাকারবারি ও মজুতদারদের বিরুদ্ধে মানুষকে মুখর করে তোলা।<sup>২২</sup> সমকালে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি বুলেটিনেও 'বাংলার বধ্যভূমি চোরাবাজার'-এর বিরুদ্ধে সরকারকে

পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানানো হয়।<sup>২৩</sup> কালীধনের 'সরকার' রাজীব বলে 'জজ মেজিস্ট্রেট এই বাবু ট্যাঁকে রাইখপ্যার পারে'। নাটকের পরের দৃশ্য চলে আসে শহরের পার্কে-ফুটপাথে বুভুক্ষু মানুষের ভিড়ে। প্রধান সমাদ্দারের পরিবার তাতে নতুন সংযোজন। দুজন ফটোগ্রাফারের বিক্রিত ও বিকৃত রুচি কঙ্কালসার নারীর মৃতপ্রায় মুখাবয়বে খুঁজে পায় 'বাংলার ম্যাডোনা'কে। আর প্রধান হয়ে যায় 'গ্রেট প্যাটরিয়ার্ক'! আগস্ট আন্দোলনে সন্তান হারানো পিতা, জাপ-আক্রমণকে আটকানোর জন্য 'চাল-বর্জন'-এ ফসলের খেত পুড়িয়ে দেওয়া চামি, জোতদারদের হাতে সস্তায় জমি বেচা উদ্বাস্ত, বন্যায়-দুর্ভিক্ষে সব হারানো ভিক্ষুক প্রধানই তো আদর্শ দেশপ্রেমিক পুরুষ! অথচ তার পরিবারের গৃহবধূ বিনোদিনী ক্ষুধার জ্বালায় এক টাউটের প্রলোভনে পাড়ি দেয় অন্ধকারের পথে। আমাদের কানে অনুরণন তোলে সামান্য কটা টাকার বিনিময়ে মেয়েকে বেঁচে দেওয়া চন্দরের কান্না, ''মেয়ে বিক্রি করলাম আমি। মাতিরে আমি বেচে ফেললাম। (কাঁদে ফেলে) মাতি, আমার মা, মাতঙ্গিনী—''<sup>২8</sup> এক মাতঙ্গিনীকে আমরা দেখেছি আগস্ট আন্দোলনে ইংরেজের গুলির সামনেও জাতীয় পতাকা হাতে সটান দাঁড়িয়ে থাকতে। আর এক মাতঙ্গিনীকে তার পিতা দুটো ভাতের আশায় বেচে দেয় চরিত্রহীন জোতদারের কাছে।

এরকমই আরেকটি বৈপরীত্যের ঘটনা আমরা দেখতে পাই নাটকের দ্বিতীয় অঞ্চের তৃতীয় দৃশ্যে। বিয়ের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শহুরে অর্থবান মানুষ খোলামকুচির মতো পয়সা ওড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলছে অতিথি সমাগমের সংখ্যা নিয়ে। কোনো প্রতিকার নেই, প্রতিরোধ নেই; পুলিশ, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট সব এঁরা কিনে রেখেছে। তাদের মুখে কালোবাজারির প্রশংসা; তাদের উচ্ছিষ্ট খাদ্য চলে যাচ্ছে আন্তাকুঁড়ে। কুঞ্জ ও রাধিকা কুকুরের সঙ্গে মারামারি করে আন্তাকুঁড় থেকে সেই খাবার খুঁটে খায়। ভ্রষ্ট সময়ে দাঁড়িয়ে চূড়ান্ত অমানবিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রধানের কণ্ঠস্বর শোনা যায়,

"আর কত চেঁচাব বাবু দুটো ভাতের জন্যে! তোমরা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু—কিছু কানে শোন না? অন্তর কি সব তোমাদের পাষাণ হয়ে গেছে বাবু! ও বাবারা—বাবু—কত অন্ন তোমাদের রাস্তায় ছড়াছড়ি যাচ্ছে বাবু, আর এই বুড়ো মানুষটারে এক মুঠো অন্ন

দিতে তোমাদের মন সরে না বাবু। বাবু তোমাদের কি প্রাণ নেই বাবু! ও বাবারা, বাবু...ও বাবারা..."<sup>২৫</sup>

যে কৃষক নিজে হাতে ফসল ফলিয়েছে, সে আজ খাদ্যের কাঙাল। এই দুর্ভাগা দেশে এর চেয়ে বড়ো অভিশাপ আর কি হতে পারে! আর তখন গ্রামে কালীধন, হারু দত্তের আড়তে সওয়া লাখ মন চাল মজুত করে রাখা হয়েছে চড়া দামে বিক্রি করা হবে বলে। পুলিশি গ্রেপ্তার যে শুধুমাত্র জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য, তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

ফলে বাংলার প্রায় সমস্ত গ্রাম আজ উঠে এসেছে শহরের লঙ্গরখানায়। সরকার এদের খাদ্যের ব্যবস্থা করেনি, কলকাতাকে দুর্ভিক্ষমুক্ত রাখার জন্য এদেরকে লরি করে দূর-দূরান্তে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। কেবল খাদ্যাভাব নয়, ম্যালেরিয়ার মড়কও কেড়ে নিচ্ছে শত-শত অসহায় মানুষের প্রাণ। অথচ তার সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য পর্যাপ্ত ওম্বুধ, চিকিৎসা সামগ্রী নেই। এক হাসপাতালে প্রধানকে দেখি উন্মাদ অবস্থায়। তার সারা শরীর জুড়ে একটা অব্যক্ত ব্যথা পালিয়ে পালিয়ে বেরোয়। এই রোগের একটাই চিকিৎসা, "ভুলে যাও। ভুলে যাও ব্যথার কথা! ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। ভূলে যাও।"<sup>২৬</sup>

চতুর্থ অঞ্চের প্রথম দৃশ্যে চাষিরা পুনরায় গ্রামে ফিরে আসে। নিরঞ্জন, দয়াল, বরকতসহ সকল কৃষকরা 'গাঁতায় থেটে' আবার সোনার দিন ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। দুর্ভিক্ষের পর কৃষকদের গাঁতায় থেটে ফসল ঘরে তোলার কাহিনি বিজন ভট্টাচার্য পেয়েছিলেন তাঁর সহকর্মী গঙ্গাপদ বসুর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে।<sup>২৭</sup> কোনো ব্যক্তির একার নেতৃত্ব নয়, সকলের যৌথ আলোচনায় নানা অস্পষ্টতা, জড়তা, কুসংস্কারের সঙ্গে লড়াই করে তারা মিলিত সিদ্ধান্তে সোঁছোয়। এরপর দেখি সকল ধান কাটা হয়েছে 'ধর্মগোলায়' সঞ্চয় করার জন্য। আবার নবান্ন উৎসব হবে, মোরগ লড়াই হবে, চাষিরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অনাগত কোনো দুর্ভিক্ষকে প্রতিরোধ করবে। মন্বন্তরের নৃশংসতার বাস্তব-মর্মস্পর্শী কাহিনি চিত্রণের পাশাপাশি 'নবান্ন' হয়ে উঠতে চেয়েছিল আশাবাদের দ্যোতক। দয়ালের সংলাপে নতুন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়ে নাটক শেষ হয়,

"গতবারের মতো এবার আর আকাল আচম্বিতে এসে আমার চোখের ওপর থেকে আমারই পরিজন, আমারই স্বজন, আমারই বন্ধুবান্ধব, (জনতার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে) এই এরাই তো আমার আত্মীয় পরিজন, ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এদের।... জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার। জোর প্রতিরোধ।"<sup>২৮</sup>

কিন্তু কে সেই শত্রু? কার বিরুদ্ধে জোর প্রতিরোধ? তার পদ্ধতিই বা কী? গাঁতায় খেঁটে ধর্মগোলা তৈরি করার মাধ্যমে একটি রোমান্টিক কমিউনিজমের ধাঁচ লক্ষ্য করা গেলেও তার বাস্তব উপযোগিতা কতদূর? 'নবান্ন' নাটক এরকম অসংখ্য প্রশ্নের কোনো উত্তর দিয়ে যায় না। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির 'ঝুটা স্বাধীনতা' নীতির কালে যখন গণনাট্য সংঘের ভাবনাতেও ব্যাপক বদল আসে, 'নবান্ন'-এর বৈপ্লবিক ও ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে থাকে। হারু দত্ত বা কালীধন খাঁড়াদের আইনত কোনো শান্তি হবে না, কিন্তু কৃষকরা তাদের কীভাবে প্রতিরোধ করবে তার উত্তরও দেওয়া হয়নি। দর্শন চৌধুরী কৃষকদের এই প্রশ্নগুলির সঙ্গে তেভাগা আন্দোলনকে জুড়ে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

"১৯৪৪-এর শেষদিকের নাটক নবান্ন তার প্রস্তুতি গড়ে তুলতে পারেনি। 'তে-ভাগা' আন্দোলনের অসংখ্য কৃষকের মৃতদেহের মধ্যে একটু খুঁজলেই প্রধান-দয়াল-কুঞ্জ-বরকত-রহমতুল্লাদের দেখতে পাওয়া যাবে। রাধিকা-বিনোদিনীই হয়তো কাকদ্বীপের অহল্যা হয়ে যেত।"<sup>২৯</sup>

তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে দুর্ভিক্ষ-খাদ্য সংকটের যোগসূত্রকে যদি আমরা আপাতত সরিয়ে রাখি, তাহলেও দেখব দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস মন্বন্তর পেরিয়ে অব্যাহত রয়েছে। মন্বন্তরের আগুন বহু মানুষের প্রাণ গ্রাস করার পরও স্বাধীনতার প্রাক-মুহূর্তে ধিকধিক করে জ্বলছিল। যে-কারণগুলির জন্য বাংলার বুকে দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছিল তার মধ্যে যুদ্ধ ছাড়া কোনো সমস্যারই সমাপ্তি ঘটেনি। সরকারি খাদ্যনীতির পরিবর্তন বা চোরাবাজারির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা কোনোটাই দায়িত্ব সহকারে পালন করা হয়নি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ রাজ্য সম্মেলনের 'খাদ্য সম্পর্কীয়

প্রস্তাব'-এ পুনরায় দুর্ভিক্ষের আগমন সম্পর্কে সচেতন করা হয়। তাদের রিপোর্টে জানা যায় ১৯৪৬-৪৭ সালে সমগ্র বাংলা জুড়ে সরকারের পক্ষে ১২-১৩ কোটি মন চাল সংগ্রহ করার সম্ভাবনা থাকলেও মাত্র ১ কোটি মন চাল সংগৃহীত হয়েছে। বাকি উৎপাদিত চাল জমা হয়েছে মজুতদারের আড়তে।<sup>৩০</sup> অথচ খাদ্যসংকটের ধারাবাহিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রাজ্য-রাজনীতি প্রায় নিশ্চুপ। দু-বছরের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি, আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তি আন্দোলন, রশিদ আলি দিবস, নৌবিদ্রোহ, ভ্রাতৃযাতী দাঙ্গার মতো ঘটনার প্রভাবে বাংলার রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে গিয়েছিল। রাজনৈতিক দলগুলির কাছে খাদ্যসংকটের থেকে স্বাধীনতার নামে দেশভাগের ঘৃণ্য খেলায় সাফল্য-ব্যর্থতোর অঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাংলার শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের পক্ষেও বিরাট রাজনৈতিক চালচিত্রে ঘটে চলা অসংখ্য ঘটনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওঠা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া দুর্ভিক্ষের ভয়ংকর আঘাত সামলে ওঠার পর খাদ্যাভাবের বিস্তৃত চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাণশক্তি বাঙালির মনে অবশিষ্ট ছিল না।

# স্বাধীনোত্তর কালে খাদ্যসংকটের ইতিহাস ও গণনাট্য সংঘের নাটক :

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। দাঙ্গবিধ্বস্ত ভগ্ন স্বাধীনতার রূপ-রস বুঝে ওঠার আগেই উদ্বাস্ত মানুষের ঢেউ আছড়ে পড়ল বাংলার বুকে। অসংখ্য সমস্যায় জেরবার মানুষ দেখল স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক সরকার মানুষের খাদ্য-বস্ত্রের সংস্থান নিয়ে উদাসীন ভূমিকা পালন করছে। ১৯৪৮ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু হওয়ার পরেও পশ্চিমবঙ্গে চাল উৎপাদনের ফলন কমতে থাকে।<sup>৩১</sup> এই পরিস্থিতিতে বাংলার মানুষের যেখানে দৈনিক ১০ ছটাক চাল প্রয়োজন সেখানে সরকারি রেশনিং থেকে ৩০ টাকা মন দরে ৬ ছটাক করে চাল দেওয়া শুরু হয়।<sup>৩২</sup> সরকার থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রকৃতির খামখেয়ালিপনাকে দোষ দেওয়া হয়। কিন্তু ভূমিসংস্কার নীতিকে বোকা বানিয়ে জমিদার-জোতদারদের পতিত ২০ লাখ একর আবাদযোগ্য জমি নষ্ট হওয়া সরকারের চোখে পড়েনি। যেখান থেকে বাৎসরিক প্রায় অতিরিক্ত দু-লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন সম্ভব ছিল।<sup>৩০</sup> ফসলে ঘাটতির সুযোগে ফসল চড়া দামে বাজারে আসতে শুরু করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারত্ব ও কর্মী

ছাঁটাই-এর ফলে মধ্যবিত্ত মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও তলানিতে ঠেকেছে। যদিও তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী জনাব রফি আহমেদ কিদোয়াই চোরাবাজারির অস্তিত্বসহ খাদ্যসংকটের সমস্ত দায় অস্বীকার করেন। ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের ৮টি জেলার ৫০ লক্ষ মানুষ খাদ্যসংকটের কবলে পড়ে।

১৯৫৪ সালে অবস্থা সঙ্গিন হয়ে ওঠায় সরকার থেকে নিয়ন্ত্রণ ও 'কর্ডন' ব্যবস্থা চালু করে। এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যাপ্ত সাহায্য ও আমেরিকান 'পিএল ৪৮০' চুক্তির ফলে প্রেরিত গমের সাহায্যে খাদ্যসংকট কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আসে। আত্মতুষ্ট সরকার ১৯৫৮-তে নিয়ন্ত্রণ তুলে দিলে ফের খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হয়। সরকার চাযিদের কাছ থেকে ফসল কেনার বিক্রয় মূল্য বেঁধে দেয় ৯ টাকা। যা একেবারেই পর্যাপ্ত ছিল না। ১৯৫৫ সালে তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন জানিয়েছিলেন, ''পূর্বের তুলনায় এখন তাহারা (চাষিরা) বেশি বেশি খাদ্যগ্রহণ করিতেছেন... খাদ্য সমস্যার সমাধান হইয়াছে।''<sup>৩৪</sup> ফলে ১৯৫৮-তে এসে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মেনে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর 'সমস্যার সমাধান'-এর ফলে কলকাতায় রেশনে চালের দাম ১৯৫৮-এর আগস্টে ২৮ টাকা ও সেপ্টেম্বরে ২৯ টাকা মন।<sup>৩৫</sup> এর মধ্যে ১৯৫৭ সালের বন্যায় শস্যহানি হওয়ায় ১৯৫৮ সালে খাদ্যসংকট প্রায় দুর্ভিক্ষের রূপ নেয়। ডিসেম্বরে প্রাদেশিক কৃষাণসভা ঘোষণা করে সার্বিক পরিস্থিতি 'দুর্ভিক্ষ'-এর সামিল।<sup>৩৬</sup>

# বিচার :

১৯৫৮ সালে গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত পানু পালের লেখা 'বিচার' নাটকে খাদ্যসংকট ও দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে। নাটকের ঘটনাপট আদালতের এজলাস, যেখানে পৌঢ় আধিয়ার সতীশ মণ্ডলকে পুত্রহত্যার অপরাধে বিচারের জন্য নিয়ে আসা হয়। খাদ্যসংকটের মধ্যে দরিদ্র সতীশ সর্বস্ব বেচেও তিনদিনের অভুক্ত সন্তান মংলুর মুখে খাবার তুলে দিতে পারেনি। পঞ্চান্ন টাকা মন চাল কেনার সামর্থ্য তার ছিল না। নিজের ব্যর্থতায় পঙ্গু সতীশ ছেলের ক্ষুধার্ত চোখদুটোকে সহ্য করতে না পেরে চড় মারলে রোগজীর্ণ ছেলেটির মৃত্যু ঘটে। সকলে সতীশকে ধিক্কার জানালেও তার

হৃদয়-বেদনা বোঝার ক্ষমতা কারো নেই। সতীশের পক্ষে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে লড়তে আসা শঙ্কর উকিল প্রশ্ন তুলেছিল,

"মানুষ যে আজ অনাহারে মরছে তার জন্য দায়ী হবে কে? বিচার হবে কার? সত্যি সত্যি সতীশের ছেলের মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? যে সরকার আজ প্রশাসনে আসীন তারা যদি খাদ্যদ্রব্য সরবরাহে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা না করতে পারে—"<sup>৩৭</sup>

শঙ্করকে থামিয়ে দেন সরকারী হাকিম। তার কাছে এই প্রশ্নগুলি 'irrelevant'। আপাতত প্রয়োজনীয় এটাই যে সতীশ মণ্ডল ২৭৯ নং ধারায় 'assault amounting to murder' মামলায় অভিযুক্ত। বিচারে তার তিনবছরের জেল হলেও যারা এই দেশে খাদ্যসংকট তৈরি করে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে, সেই অজ্ঞাত অপরাধীদের কোনো বিচার হয় না। অসহায় সতীশ চিৎকার করে জানিয়ে যায়,

"কিন্তু আমার মংলুর যারা মরার কারণ, তাদের বিচার করবে কাঁয়? ভগবান সাক্ষী রাখিয়া কই—মানুষ আসিবে বিচার করিবে।... বিচার হইবে, হইবে বিচার—বিচার হইবে, হইবে বিচার।"<sup>৩৮</sup>

১৯৫৯ সালে কলকাতায় খাদ্য আন্দোলন ও ১৯৬৬ সালে রাজ্য জুড়ে খাদ্য আন্দোলনে জনসাধারণের স্বতঃস্ফুর্ততা দেখে মনে হয় সতীশ মণ্ডলের আর্তনাদ ব্যর্থ হয়নি।

#### ১৯৫৯-এর খাদ্য আন্দোলন :

১৯৫৪ সালে রাজ্যের বামপন্থী দলগুলি ন্যূনতম খাদ্যের দাবি, রেশনিং ব্যবস্থার উন্নতি, দুর্নীতিরোধ ও দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়ে 'মূল্যবৃদ্ধি দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করে। তাদের মধ্যে মতাদর্শগত ও কর্মপন্থাগত পার্থক্য থাকলেও খাদ্যসংকট মোকাবিলায় এরা রাজ্যব্যাপী মানুষকে সংগঠিত করে সরকারের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে। ১৯৫৯ সালে যা চূড়ান্ত রূপ নেয়। জুন-

জুলাই মাস থেকে মেদিনীপুর, নদীয়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বুভুক্ষু মানুষের ভিড় শহরের রাজপথ দখল নিতে শুরু করে। এ-যেন পঞ্চাশের মম্বন্তরের অনুরূপ পদধ্বনি। অন্যদিকে 'মূল্যবৃদ্ধি দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি'-র নেতৃত্বে মূর্শিদাবাদ, শান্তিপুর, রানাঘাট, আরামবাগ, গঙ্গারামপুর, জলপাইগুড়িসহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলনের উপর পুলিশি লাঠিচার্জ, বিনা বিচারে গ্রেপ্তারের মতো ঘটনা ঘটতে থাকে। ১০ আগস্ট 'মূল্যবৃদ্ধি দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি'-র পক্ষ থেকে রণেন সেন আইন অমান্য, বিক্ষোভ, পিকেটিং-এর মাধ্যমে ব্যাপক আন্দোলনের খসড়া প্রকাশ করেন। প্রত্যুত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় জানান, "সরকার ইহা (আইন অমান্য) হইতে দিতে পারেন না এবং আইন অমান্য প্রতিরোধের জন্য সম্ভবপর সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবেন।"<sup>৩৯</sup> ফলস্বরূপ ২৯ তারিখের মধ্যে নিরাপত্তা আইনে ৩৬৩ জন, আদালত অবমাননার জন্য ২৩৩ জন, নিরোধক আইনে ৯৮ জন এবং অন্যান্য ধারায় ৬০০০ জনের গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া যায়।<sup>80</sup>

১৯৫৯ সালের ৩১ আগস্ট লক্ষাধিক মানুষের<sup>83</sup> মহামিছিল রাইটার্স বিল্ডিং অভিমুখে অভিযান শুরু করে। ছ'টা নাগাদ মিছিল শহিদ মিনার থেকে রাজভবনের দিকে এগোতেই বিনা প্ররোচনায় পুলিশ বেপরোয়া লাঠিচার্জ শুরু করে। চৌরঙ্গী অঞ্চলের দিক থেকেও শুরু হয় টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া ও গুলিবর্ষণ। অর্থাৎ কলকাতার পথঘাট সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ গ্রামীণ মানুষদের ফাঁদে ফেলে মারধর করা হয়। কলকাতার রাজপথ মৃত্যু উপত্যকার রূপ নেয়। সাত জনের মৃত্যুসহ ৩৫০-৪০০ জন আহত হয়।<sup>82</sup> পরদিন রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিলেও ব্যাপক লাঠিচার্জ করা হয়। ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলকাতা, চব্বিশ পরগণা ও হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারি করে জনপ্রতিরোধের উপর গুলি চালানো হয়। ৯ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় স্বীকার করে নেন পুলিশি আক্রমণে ৩৯ জন মারা গেছে।<sup>৪৩</sup> বেসরকারি মতে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারা রাজ্য জুড়ে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের উপর পুলিশি বর্বরতায় ৮০ জন মৃত, আহত প্রায় ৩০০০ জন। গ্রেপ্তারের সংখ্যা ২০০০০ ও নিখোঁজ প্রায় ১২০ জন।<sup>৪৪</sup>

কত ধানে কত চাল :

১৯৫৯ সালের ৩১ আগস্টের কর্মসূচি প্রচারের জন্য গণনাট্য সংঘের পক্ষ থেকে পানু পালের লেখা 'কত ধানে কত চাল' পথনাটকটি অভিনীত হয়। নাটকটির পটভূমি প্রধানমন্ত্রীর (এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী) দণ্ডর, কাল- ৩১ আগস্ট। সাধারণ মানুষ খাদ্যের দাবিতে বিগত আটঘন্টা ধরে রাজভবন ঘেরাও করে রাখায় মন্ত্রী-পারিষদ ভয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের মতে 'লোকগুলোর সব চোখে খিদে' আর এদের আন্দোলনের জন্যই 'দেশটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে'। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের কালে বড়বাজারের ব্যবসায়ী কানোরিয়ার মেয়ের বিয়েতে এলাহি আয়োজন চলছে। এই ধনকুবেরকে তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী দুই লক্ষ মন চালের 'স্পেশাল পারমিট' দিয়েছিলেন বলে কমিউনিস্ট পার্টি অভিযোগ করেছিল।<sup>৪৫</sup> অন্যদিকে রফি আহমেদ কিদোয়াই প্রবর্তিত 'ক্রমিক বিনিয়ন্ত্রণ' নীতির প্রশংসায় মন্ত্রীমণ্ডলী পঞ্চমুখ। ব্যঙ্গাত্মক সংলাপে মন্ত্রীমহোদয়দের দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, চরিত্রহীনতা জনসমক্ষে উন্মোচিত হতে থাকে। জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে 'প্রধানমন্ত্রী' রাজ্যের মানুষকে স্বত্বিক জীবনযাপনের পরামর্শ দেন। তাঁর অদ্ভূত যুক্তি চাম্বিরা ঢেঁকিওয়ালাদের কাছে যাওয়ায় এবার চাল সংগ্রহ করা যায়নি। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, রেশনের চালের পরিমাণ বাড়ানো হবে না, সাবসিডি বা রিলিফ দেওয়া হবে না। রাজপথে তখন লক্ষাধিক মানুষ প্রধানমন্ত্রীর কাছে সদুন্তরের জন্য জমায়েত করেছে। তিনি ঘোষণা করেন, 'যাও—ওদের লাঠি মারতে বল—গুলি চালাতে বল—'

বান্তবে গুলিচালনায় মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল। নাটকে হাজার হাজার জনতা অত্যাচার প্রতিরোধ করে প্রধানমন্ত্রীর মুখোমুখি হয়। তাদের বাক্যবাণে প্রধানমন্ত্রী অন্যায় স্বীকার করে নেন। ফিরে যাওয়ার সময় জনতার প্রতিনিধিরা প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে যায়, ''আপনাদের আমরাই ঐ সুখের গদিতে বসিয়েছি, আমরাই আবার ওখান থেকে টেনে নামাব।'' পথনাটিকার পদ্ধতি অনুযায়ী নাটকটিতে একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রচারসর্বস্বতা প্রাধান্য পেয়েছে। চরিত্রদের একটি ধাঁচ তৈরি করে বিশেষ মতামত সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। কিদোয়াই নীতি, কানোরিয়ার দুর্নীতি, লেভি আদায় বা প্রধানমন্ত্রী-খাদ্যমন্ত্রীর অসংবেদনশীল বক্তব্যের বাস্তব অনুষঙ্গের ব্যবহারে নাটকটি তৎকালে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়।

#### ছয়ের দশকে অব্যাহত খাদ্যসংকট :

১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন, পুলিশি বর্বরতা, বাংলার অব্যাহত খাদ্যসংকটের মধ্যেই সীমান্তে বেঁধে গেল চিন-ভারত যুদ্ধ। দশকব্যাপী মতাদর্শগত সংঘাত সীমান্ত-যুদ্ধকে কেন্দ্র করে চরম পর্বে পৌঁছোনোর পর কমিউনিস্ট পার্টি দু-টুকরো হয়ে যায়। খাদ্যসংকটের বিরুদ্ধে বামপন্থী শক্তিগুলির সমস্যাভিত্তিক ঐক্যও চুরমার হয়ে যায়। ১৯৬২-তে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর মুখ্যমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হন পূর্বতন খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন। যার খাদ্যনীতি ও দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যের বিরোধিতা করেছিলেন বামপন্থীরা। ১৯৫৯-র খাদ্য আন্দোলনের অন্যতম দাবি ছিল খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের অপসারণ।<sup>৪৬</sup>

১৯৬২-র নির্বাচনী প্রচারে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি অভিযোগ করে যে বিগত দশ বছরে মাথা পিছু খাদ্য উৎপাদন ৪.১ মন থেকে কমে ৩.৬ মন হয়েছে। তাদের তথ্য অনুযায়ী দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মিলিয়ে ৬০ কোটি টাকা ব্যয় করা সত্ত্বেও ১৯৫৯-৬০ সালে ২ লক্ষ টন কম ধান উৎপাদিত হয়েছে।<sup>৪৭</sup> আমরা একটি তালিকার মাধ্যমে ষাটের দশকের প্রথমার্ধে চাল উৎপাদন ও চালের দামের তুলনামূলক অবস্থান তুলে ধরতে পারি:<sup>৪৮</sup>

সাল	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৫-৬৬
উৎপাদিত চাল	৪৮ লক্ষ	88 লক্ষ	৫৩ লক্ষ	৬৭ লক্ষ	৪৯ লক্ষ
(64)					
মন প্রতি চালের	২৪-২৫	১৪-২৮	৩৫-৪৫	৩৬-৩৮	৬০-১০০
দাম (টাকা)					

দেখা যাচ্ছে ১৯৬৪-৬৫ সালে পর্যাপ্ত ফসল হওয়া সত্ত্বেও চালের দাম খুব একটা কমেনি। বরং ১৯৬৫-৬৬ সালে কোনো কোনো জায়গায় চালের দাম মন প্রতি ১০০ টাকা ছুঁয়ে ফেলে। সরকার চাষির থেকে ১৬ টাকা মন দরে ধান কেনা শুরু করলেও মিল মালিক, জোতদার, এমনকি ছোটো

চাষির উপরেও ১০০ শতাংশ লেভি ঘোষণা করা হয়। দুর্নীতির জোরে রাঘব-বোয়ালরা বেঁচে গেলেও চাষিরা স্বল্পমূল্যে সরকারকে চাল বিক্রি করার বদলে জোতদার-মহাজনদের কাছে চাল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ঘোষিত ১৫ লক্ষ টন চালের বদলে সংগৃহীত হয় মাত্র ৫ লক্ষ টন। কর্ডনের দোহাই দিয়ে ঘাটতি জেলাগুলোতে চাল সরবরাহ না করায় সেই সব অঞ্চলে খাদ্য-সমস্যা তীব্র রূপ ধারণ করে। মফস্বল অঞ্চলে বিধিবদ্ধ রেশনে খাদ্যশস্যের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হল, সংশোধিত রেশন তুলে দেওয়া হল।<sup>৪৯</sup> ফলে ফসল উৎপাদন ভালো হওয়া সত্ত্বেও খাদ্যসংকটের কোনো সরাহা হল না।

কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙনের প্রাথমিক ধাক্কা সামলে উঠে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বা সিপিআই(এম) নতুন উদ্যমে খাদ্য আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করে। অন্যান্য বামপন্থী দলগুলিও ১৯৫৯-এর আন্দোলনের দুর্বলতা ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে অনেক বেশি সংগঠিত ও সংঘবদ্ধভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময়ে গণনাট্য সংঘের একাধিক নাটকে খাদ্য সমস্যার চিত্র উঠে আসে।

# শিবঠাকুরের দেশে :

১৯৬৪ সালে প্রযোজিত অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শিবঠাকুরের দেশে' প্রহসনটিতে মধ্যবিত্ত জীবনে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সমস্যার প্রেক্ষাপটটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মনস্তত্ত্বের ডাক্তার অজয় বোস 'বিমূর্ত শিল্প' দেখিয়ে রোগীদের সুস্থ করে তোলেন। তিনি আপাতত ফোনে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর চিকিৎসা করছেন, যিনি ভোটে হারা সত্ত্বেও ফের মন্ত্রী হতে চান। তাঁর নতুন 'রোগী' বিশ্বনাথ নাকি আগে ফায়ার ব্রিগেডে কাজ করত, কিন্তু বাজারের আগুন দাম নেভাতে না পেরে পাগল হয়ে গেছে। ডাক্তার সমস্যার গভীরতা বুঝতে না পেরে তাকে জল ছেটানোর বুদ্ধি দেয়। বিশ্বনাথ ডাক্তারের মাথায় জল ঢেলে উদ্ভট সমাধানের যোগ্য জবাব দেয়। নাটকটিতে খাদ্য-সংকটের অনুষঙ্গে মূল্যবৃদ্ধির কারণ ও মধ্যবিত্ত জীবনে তার কুপ্রভাবের দিকটি স্পর্শ করা হয়নি। ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মতো গুরুতর সমস্যার প্রেক্ষিতে রচিত হলেও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের স্যাটায়ারের বদলে কৌতুক রসের অত্যধিক প্রাবল্য দেখা যায়।

# অন্নপূর্ণার দেশে :

শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অন্নপূর্ণার দেশে' নাটকে খাদ্য সংকটের অন্যতম মূল কারণ রূপে ভূমিসংক্ষার নীতির ব্যর্থতার কথা উঠে এসেছে। গ্রাম্য মহাজন গোলকপতির বাড়ি থেকে নন্দ তার অভুক্ত মেয়ের জন্য ভাত চুরি করে। কিন্তু পুলিশের কাছে কৃষক সভার সেক্রেটারি কমিউনিস্ট নেতা নিতাই মণ্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়। নন্দকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে তাকে 'চুরি'র ঘটনার প্রধান সাক্ষী হতে বলে। নন্দর মনে পড়ে মালিক গোলকপতি তার প্রাপ্য টাকা না দেওয়ার যুক্তি হিসেবে তার হাতে নেশার পুরিয়া তুলে দিয়ে বুঝিয়েছিল, ''মেয়ে না বাঁচলে ক্ষতি কি? এই পুরিয়াই তোকে সব দুঃখু থেকে আড়াল করে রাখবে।''<sup>৫০</sup> তাই নন্দ প্রথমে রাজি হলেও শেষে গ্রামের মানুষের কথা, নিজের মেয়ের কথা ভেবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করে। নাটকের শেষে খিদের তাড়নায় নন্দর মেয়ে পুঁটির মৃত্যুতে সবাই স্তম্ভিত হয়ে যায়। বাস্তবিক কৃষক যদি জমির অধিকার না পায়, ভাগচাষি যদি উচ্ছেদের ভয়ে আতংকিত থাকে, যদি তাকে মহাজনের থেকে দাদন নিতে হয়, তবে ফসলের উৎপাদন কমতে বাধ্য। যা মজুতদারি ও কালোবাজারির হাতকেও শক্ত করে। ফলে নাটকটিতে সার্বিক কৃষক আন্দোলনকেই খাদ্যসংকট থেকে মুক্তির উপায় রূপে চিহ্নিত করা হয়।

### আত্মহত্যা আইনী কর :

শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আত্মহত্যা আইনী কর' পথনাটকটি খাদ্যসংকটের সুযোগে শাসক দলের ঘৃণ্য রাজনীতি ও চোরাকারবারিদের যোগসাজশের প্রতিবাদে রচিত। নীলকমলের স্ত্রী সন্তানের অভুক্ত থাকার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে শিশুটিকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে পাগল হয়ে গেছে। উদ্ভ্রান্ত নীলকমলকে 'আত্মহত্যার চেষ্টার' অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আপাতত কংগ্রেস কর্মী গোপাল ও 'সংশোধনবাদী বামপন্থী' নিবারণের উপর দায়িত্ব পড়েছে নীলকমলকে দিয়ে স্বীকার করানোর যে তার স্ত্রী আগে 'পাগল' হয়ে এই কাজটি করেছে। আর এদের উপরে আছে মন্ত্রী রাধামাধব। নীলকমল মুচলেকা না দিলে প্রমাণ হয়ে যাবে যে দেশে সত্যিই খাদ্যসংকট আছে এবং সে ব্যাপারে সরকার

উদাসীন। এক সন্তানহারা পিতা, এক মানসিক অবসাদগ্রস্থ স্বামী, এক ক্ষুধার্ত নাগরিকের পাশে দাঁড়ানোর বদলে রাষ্ট্র তাকে মানসিক-শারীরিকভাবে ভেঙে দিয়ে প্রয়োজনীয় সংলাপটুকু পাঠ করে যেতে বাধ্য করে। তাদের মূল অস্ত্র 'Diversionary Foreign Policy'-তে 'ভারতের উত্তর সীমান্তে বর্বর চিনা আক্রমণ', 'দেশের প্রতি আমাদের পবিত্র দায়িত্ব' প্রভৃতি মহান বাণী। নীলকমল বিনীত অনুরোধ করে,

"চোরাকারবার আইনি করে আমাদের হত্যা করার সব ব্যবস্থাই তো আইনে পাকা করেছেন। এবার ওই 'হত্যার' আগে 'আত্ম' এই কথাটুকু যোগ করে দিয়ে আত্মহত্যাটাকে আইনি করুন। আমাদের সব জ্বালা জুড়োক।"<sup>৫১</sup>

বামপন্থী আদর্শে শিক্ষিত নীলকমল শ্রমিক-আন্দোলনে যুক্ত হওয়ায় তাকে কারখানা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তাকে সারা জীবন ক্ষুধার সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। কিন্তু আজ মৃত মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে, উন্মাদিনী স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তার সব থেকে বড়ো পরীক্ষা। তাই শত উৎপীড়ন সহ্য করেও সে ভেঙে পড়ে না। নীলকমল শেষ পর্যন্ত মুচলেকা দেয়। কিন্তু তার মুচলেকা 'চোরের স্বার্থে, খুনির স্বার্থে, দালালের স্বার্থে, বড়লোকের স্বার্থে—' নয়, বরং 'দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে'। উন্মুক্ত কণ্ঠে সে স্বীকারোক্তি পেশ করে,

"আমি স্বীকার করছি আমার স্ত্রী সেই নরখাদক রাক্ষসের পরমায়ু না জেনে নির্বোধের মতো ভাগ্যের হাতে আমাদের সন্তানকে সঁপে দিয়েছে।... কিন্তু আমি অঙ্গীকার করছি। এই ভুল আর আমরা করব না। আমরা চিনেছি সেই দস্যুদের, যারা মানুষের বিশ্বাসকে পায়ে মাডিয়ে ক্ষমতার উচ্চ আসনে বসে আছে।"<sup>৫২</sup>

নীলকমলের প্রতিবাদে সরকারের সমস্ত চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যায়। বিরোধীপক্ষের আক্রমণাত্মক সমালোচনা, দায়িত্ববান সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নবাণ, মহামান্য বিচারালয়ের নির্দেশ—সব মিলিয়ে রাজ্য সরকারের চক্রান্ত চুরমার হয়ে যায়। বাইরে জনতার স্লোগান ওঠে, 'ভেজালকারীদের ফাঁসি দাও, নইলে গদি ছেড়ে দাও'।

১৯৬৬ সালে বসিরহাটে খাদ্য-কেরোসিনের দাবিতে অবস্থানরত জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে পনেরো বছরের কিশোর ছাত্র নুরুল ইসলাম প্রাণ হারায়। গুরুতর আহত হয় মণীন্দ্র বিশ্বাস নামের আরেক কিশোর। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই পড়তেই গ্রামবাংলা অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পরবর্তী কয়েকদিনের ঘটনাক্রমে ৪০ জন মানুষ নিহত ও কয়েক হাজার মানুষ আহত হন।<sup>৫০</sup> ১৯৫৯-র মতো কলকাতা শহর নয়, এবারের আন্দোলনের ভরকেন্দ্র সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ। দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ আছড়ে পড়ল পুলিশ-প্রশাসন-শাসকের উপর। সিপিআই(এম) ও অন্যান্য বামপন্থী দলসহ ডানপন্থী, গান্ধীবাদী দলগুলিও বিধানসভায় প্রফুল্ল সেন-অতুল্য ঘোষের কংগ্রেস সরকারকে কোণঠাসা করে ফেলে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর বাংলার রাজনৈতিক বিন্যাসের কাঠামো বদলে যায়। যার সূত্র ধরে ১৯৭৭-এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) দীর্ঘদিনের জন্য বাংলার শাসনভার গ্রহণ করে। ক্রমে খাদ্য সংকটের ভয়ংকরতাও হ্রাস পায়। 'নবান্ন'-এর পরান মণ্ডলরা সামগ্রিক 'জোর প্রতিরোধ'-এর ডাক দিয়ে খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। কিন্তু নিতাই মণ্ডল, নীলকমলরা একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সাংসদীয় গণতন্ত্রে ক্ষমতাসীন হওয়াকেই খাদ্য-সমস্যার সমাধান রূপে দেখেছিলেন। অন্তত খাদ্যসংকট সমাধানের ব্যাপারে তাদের রাজনৈতিক স্লোগান সাফল্য লাভ করেছিল।

#### তথ্যসূত্র :

- ১। পল গ্রিনো; আধুনিক বাংলা : সমৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩-৪৪, (অনুবাদ- সুপ্রিয় গুহ, রীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু দাশগুপ্ত, বরেন ভট্টাচার্য), কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৭, পৃ- ৭৪
- ২। সুমিত সরকার; আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০১৩, পৃ- ৩৪৫
- ত। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় (সংকলন ও সম্পাদনা); প্রবাসী, কার্তিক ১৩৫০, উপোসি বাংলা সাময়িকপত্রে পঞ্চাশের মন্বন্তর, সেরিবান, ২০১১, পৃ- ৬৫-৬৬

৪। সব্যসাচী ভট্টাচার্য; ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি (১৮৫০-১৯৪৭) (সম্পাদনা- অশীন দাশগুপ্ত), আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪০৬ বঙ্গান্দ, পৃ- ৬৯

৫। ড. বিনতা রায়চৌধুরী; পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য, সাহিত্যলোক, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃ- ১২ ৬। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ জানুয়ারি, ২০০১

৭। প্রেমাংশুকুমার মুখোপাধ্যায়; ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষ : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা ও পার্লামেন্টের ভূমিকা; ৪৩-এর মম্বন্তরের ৬০ বছর, নন্দন, জুন ২০০৩, পৃ- ১৬ ৮। প্রাগুক্ত, মাসিক বসুমতী, আশ্বিন ১৩৫০, উপোসি বাংলা সাময়িকপত্রে পঞ্চাশের মন্বন্তর, পৃ-১২৯

৯। প্রাগুক্ত, মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৫০, উপোসি বাংলা সাময়িকপত্রে পঞ্চাশের মন্বন্তর, পৃ- ১১৯

১০। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); মৃত্যু ও মহামারীর বিরুদ্ধে খাদ্যের জন্য লড়ো, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯, পু- ৩০৩

১১। প্রাগুক্ত, উদ্বোধন, কার্তিক ১৩৫০, উপোসি বাংলা সাময়িকপত্রে পঞ্চাশের মম্বন্তর, পৃ- ২৮ ১২। ড. মানস মজুমদার; পঞ্চাশের মহামম্বন্তর ও বাংলা ছোটোগল্প, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৪, পৃ- ৬৬ ১৩। প্রাগুক্ত, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৫০, উপোসি বাংলা সাময়িকপত্রে পঞ্চাশের মন্বন্তর, পৃ- ৫১ ১৪। প্রাগুক্ত, ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৫০, উপোসি বাংলা সাময়িকপত্রে পঞ্চাশের মন্বন্তর, পৃ- ১০১ ১৫। Amartya Sen; Poverty and Famines : An Essay of Entitlement and Deprivation, Oxford University Press, 1981 p- 52.

১৬। প্রাগুক্ত, বঙ্গশ্রী, মাঘ ১৩৫১, উপোসি বাংলা সাময়িকপত্রে পঞ্চাশের মম্বন্তর, পৃ- ২৩০ ১৭। বিজন ভট্টাচার্য; অভিজ্ঞতার থিয়েটার, গন্ধর্ব, ক্রমিক সংকলন ৩০, আশ্বিন ১৩৮৪, পৃ- ১৪ ১৮। Somnath Lahiri; 'Queues of Death in Calcutta', People's War, 5 September 1943, 'নবান্ন' প্রসঙ্গে, (অনুবাদ শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়), নবান্ন, বিজন ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪, পৃ- ১২

- ১৯। প্রাগুক্ত, তৃপ্তি মিত্র সাক্ষাৎকার; ২২ জুলাই ১৯৮৩, 'নবান্ন' প্রসঙ্গে (শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা উদ্ধৃত), নবান্ন, পূ- ১৩।
- ২০। বিজন ভট্টাচার্য; জবানবন্দী, রচনাসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, (সম্পাদনা- নবারুণ ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়), দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, পু- ২৯
- ২১। প্রাগুক্ত, বিজন ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার; শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নবান্ন' প্রসঙ্গে, নবান্ন, পৃ- ১৪
- ২২। তদেব, পৃ- ১৬
- ২৩। প্রাগুক্ত, মৃত্যু ও মহামারীর বিরুদ্ধে খাদ্যের জন্য লড়ো, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খণ্ড, পৃ- ২৯৯
- ২৪। বিজন ভট্টাচার্য; নবান্ন, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪, পৃ- ৮১
- ২৫। তদেব, পৃ- ৭৭
- ২৬। তদেব, পৃ- ৯৮
- ২৭। গঙ্গাপদ বসু; নাটক ও নাট্য আন্দোলন, আনন্দধারা প্রকাশন, মাঘ ১৩৭৮, পু- ১৩
- ২৮। প্রাগুক্ত, নবান্ন, পৃ- ১২০
- ২৯। দর্শন চৌধুরী; গণনাট্য আন্দোলন, অনুষ্টুপ, ২০০৯, পৃ- ২২০
- ৩০। প্রাগুক্ত, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খণ্ড, পৃ- ১৫৫
- ৩১। মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত (সম্পাদনা); খাদ্য সংকটের গোড়ার কথা : খাদ্যসংকট ও কিদোয়াই নীতি, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, সপ্তম খণ্ড, মনীষা, মে ২০১১, পৃ- ২১০
- ৩২। তদেব, পু- ২১৪
- ৩৩। প্রাগুক্ত, সকলের জন্য খাদ্য চাই, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, সপ্তম খণ্ড, পৃ- ১৯৯
- ৩৪। বিধানসভার কার্যবিবরণী, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৫

- ৩৫। বিশ্বনাথ মুখার্জি; খাদ্যসংকট কেন এবং সমাধান কী, Food movement of 1959, Documenting a turning point in the history of West Bengal, Suranjan Das and Premansu kumar Bandyopadhyay (Editor), K. P. Bagchi & Company, 2004, Kolkata. পৃ- ৭৭
- ৩৬। প্রাগুক্ত, খাদ্যসংকট ও তার প্রতিকার, Food movement of 1959, Documenting a turning point in the history of West Bengal, পৃ- ৪৯

৩৭। পানু পাল; বিচার, অভিনয় পত্রিকা, ২৩ বর্ষ, শারদ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ- ৬৭

৩৮। তদেব, পৃ- ৭০

৩৯। যুগান্তর, ১৭ আগস্ট, ১৯৫৯

- ৪০। প্রাগুক্ত, পশ্চিমবঙ্গের গণআন্দোলন ও খাদ্য আন্দোলন, ডঃ দিলীপ মজুমদার, Food movement of 1959. Documenting a turning point in the history of West Bengal, পৃ- ৫২৬
- ৪১। তদেব, পৃ- ৫৩১
- ৪২। তদেব, পৃ- ৫৩২
- ৪৩। স্বাধীনতা, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯
- 8৪। প্রাগুক্ত, কনক মুখার্জি; বাংলা বাঁচাও অভিযান, Food movement of 1959. Documenting a turning point in the history of West Bengal, পৃ- ১২৬
- ৪৫। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮, পৃ- ৬১০
- ৪৬। প্রাগুক্ত, সুধাংশু দাশগুপ্ত; সংগ্রামের অগ্রগতি, Food movement of 1959, Documenting a turning point in the history of West Bengal, পৃ- ১৪৯

৪৭। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); পশ্চিমবাংলার আসন্ন সাধারণ নির্বাচন (১৯৬২) উপলক্ষ্যে কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, চতুর্থ খণ্ড, ন্যাশনাল বুক

৪৮। প্রাগুক্ত, বিশ্বনাথ মুখার্জি; খাদ্যসংকট কেন এবং সমাধান কী, Food movement of 1959,

Documenting a turning point in the history of West Bengal, श्- १२

৫০। শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়; অন্নপূর্ণার দেশে, গণনাট্য পত্রিকা, ২ বর্ষ, জানুয়ারি ১৯৬৬, পৃ- ৭২

৫১। শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়; আত্মহত্যা আইনি কর, গণনাট্য পত্রিকা, ৪০ বর্ষ, মে-জুন ২০০৫, পৃ- ১৮০

৫৩। শিবাজীপ্রতিম বসু; বাম-জনপ্রিয় আন্দোলনের এক নির্ণায়ক মুহূর্ত ১৯৫৯ ও ১৯৬৬ সালের

৪৯। তদেব, পৃ- ৭৮

৫২। তদেব, পু- ১৮০-১৮১

এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫, পু- ৯১

খাদ্য আন্দোলন, তিন দশকের গণআন্দোলন, অনিল আচার্য (সম্পাদনা), অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০১৮, পৃ- ২৩৯-২৪০

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# সাম্প্রদায়িকতা, দেশভাগ, উদ্বাস্ত পরিস্থিতি এবং গণনাট্য সংঘের নাটক

স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্মদাগের নাম দেশভাগ। একদল ক্ষমতালোভী দেশীয় রাজনীতিবিদ, মরণকামড়ে উদ্যত কুটিল শাসক ইংরেজ, কিছু অন্ধ কুসংস্কারের স্বঘোষিত ধর্মগুরু এবং তাদের ঔরসে জাত সাম্প্রদায়িক মনোভাবের এক অযাচিত 'এক্সপেরিমেন্ট'-এর নাম দেশভাগ। ফলত দেশভাগ ও উদ্বাস্ত পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িয়ে যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাস। কিন্তু কেন আমাদের এই দায় বহন করে যেতে হবে? কেন দেশভাগ? কেন ইতিহাসের দোহাই দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে দাবার বোড়ের মতো মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল? স্বাধীনতার পঁচান্তর বছর পরেও রাজনীতিবিদদের আত্মপক্ষ সমর্থনের চক্রব্যুহের মধ্যে থেকে আমরা তার সদুত্তর পাইনি। বদলে পেয়েছি অভিধানে জ্বলজ্বল করে ওঠা নতুন কিছু শব্দবন্ধ—রিফিউজি, ছিন্নমূল, শরণার্থী, উদ্বাস্ত, বাস্তহারা। এদেশের বুকে নতুন পরিচয়ের সন্ধানে উদ্বাস্তদের অনেক লড়াইয়ের পথ পেরোতে হয়েছিল। দেশভাগের আঘাতে দিশেহারা বাংলা সাহিত্য ভারতবর্ষের রাজনীতির বিশাল প্রেক্ষাপটে উদ্বাস্তদের জীবনযন্ত্রণার পূর্বাপরকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে অগ্রজ ভূমিকা নিতে পারেনি। যার দায় বাংলা নাট্যমঞ্চ এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উপরেও এসে বর্তায়। তা সত্বেও গণনাট্য সংঘের কিছু নাটকে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী, দেশভাগজনিত উদ্বাস্ত্ব পরিস্থিতির চিত্র উঠ্রে তের জিন্নাটি কি জ্বন্থ

# স্বাধীনতা—সাম্প্রদায়িকতা ও দেশভাগের সন্ধান :

একদল স্বার্থান্বেমী মানুষ যদি কোনো বিশেষ ধর্মকে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করে অন্য ধর্মের প্রতিস্পর্ধী করে তোলে তবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জন্ম হয়। ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে যে ধর্মের সঙ্গে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থের মিলন জনতাকে বিপদের দিকে ঠেলে দেয়। যতবার কোনো গোষ্ঠী বাহুবলে বা অন্ধবিশ্বাসবলে সাম্প্রদায়িকতার অপপ্রচেষ্টায় মেতে উঠেছে, ততবার তার পরিণতি দাঁড়িয়েছে— রক্তপাত। যা আসলে মনুষ্যত্বের ক্ষতি। আর মনুষ্যত্বের মৃতদেহের উপর দাঁড়িয়ে যে ধর্মের শঙ্খনাদই বাজানো হোক না কেন, ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাকে কখনই বিজয়বার্তা বলে মেনে নেন না।

বাংলার বুকে আজ পর্যন্ত ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সব থেকে বড় প্রমাণ ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা। যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলা তথা ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম মানুমের সম্পর্কের দীর্ঘ ইতিহাস। এদেশে ইংরেজদের আগমন ঘটেছিল মুসলিম শাসকদের হারিয়ে। ইংরেজদের পাশ্চাত্য জ্ঞান-শিক্ষার আলোয় উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত হিন্দু যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার আস্বাদ ভোগ করেছিল, সংকীর্ণ পশ্চাদগামিতার কারণে মুসলিম সম্প্রদায় তার সুযোগ গ্রহণ করেনি। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের পর অভিজাত হিন্দু সম্প্রদায় জমিদার হয়ে ওঠার কারণে পূর্ববঙ্গের মুসলিম জনপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে ভূমি সম্পর্ককে ঘিরে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। পরে মুসলিম লিগের উৎপত্তি ও মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্ব সর্বভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিমদের একটি বৃহৎ মঞ্চ করে দেয়। জিন্না লিগের সাফল্য ও তাঁর ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'কে ক্রমশ সাম্প্রদায়িক করে তোলেন। ১৯৪০ সালে লিগের লাহোর অধিবেশনে জিন্না ঘোষণা করলেন ঐতিহাসিক 'পাকিস্তান প্রিকল্পনায় অনেকেই 'পাকিস্তান প্রস্তাব'-এর সিঁদুরে মেঘ দেখতে পান।<sup>১</sup> কংগ্রেস তার বিরোধিতা করায় স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম জনতার মধ্যে কংগ্রেসের প্রতি বিক্ষুক্বতা আরও বাড়তে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীনতার আলোচনার সময়ে শুরু হল ভাগবাঁটোয়ারার প্রক্রিয়া। ১৯৪৫-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৬-এর মার্চ পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে নির্বাচন অনৃষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক সরকার গঠন এবং স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রস্তুত করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন। ইলিগের দ্বিজাতিতত্ত্বের পাকিস্তান প্রস্তাবের ফলে নির্বাচনে মুসলিম লিগ ব্যাপক সাফল্য পায়। যা মুসলিম লিগকে ভারতবর্ষের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান প্রতিনিধি রূপে প্রতিষ্ঠিত করে।<sup>°</sup> ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত আলোচনা এবং নির্বাচনের উদ্দেশ্য পুরণের জন্য ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের তিন মন্ত্রীর প্রতিনিধি দল 'ক্যাবিনেট মিশন' ভারতে এসে পৌঁছোয়। ক্যাবিনেট মিশন সমগ্র ভারতবর্ষকে ক, খ, গ তিনভাগে তিনটি গ্রুপ গঠনের প্রস্তাব দেয়। তিনটি গ্রুপের প্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় সংবিধান প্রণয়নে সাহায্য করবে।<sup>8</sup> মুসলিম লিগ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে মান্যতা দিয়েছিল, কারণ মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলির গ্রুপ গঠনের পরিকল্পনার মধ্যে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের স্বপ্নপুরণের প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু নেহরু তথা কংগ্রেসের বিরোধিতা জিন্নার পাকিস্তান গঠনের স্বপ্নে বিরাট ধার্ক্বা ছিল। তাই শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে পাকিস্তানের দাবিকে আদায় করে নেওয়ার জন্য জিন্না 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর (Direct Action) ডাক দেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টে দাঙ্গার ভয়ংকরতা ও তার পরবর্তী ঘটনাবলি দেশভাগকে ভারতবর্ষের অনিবার্য নিয়তি করে তুলেছিল।

# ছেচল্লিশের দাঙ্গা এবং পরবর্তী ঘটনাবলি :

১৯৪৬ সালের প্রথমার্ধ জুড়ে ইংরেজ শাসকের রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করে কলকাতার রাজপথ জানিয়ে দিয়েছিল যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সূর্য অস্তাচলগামী। ২৯ জুলাই ডাক-তার কর্মীদের ধর্মঘট কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম জাগ্রত জনতার স্বতঃস্ফূর্ত মৈত্রীবন্ধন এক নতুন ভারতবর্ষের সন্ধান নিয়ে এসেছিল। কিন্তু স্বপ্ন চূর্ণ হতে তিন সপ্তাহের বেশি সময় লাগল না। ৩০ জুলাই লিগের ওয়ার্কিং

কমিটির বৈঠকে ১৬ আগস্ট দিনটিকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর দিন হিসেবে চূড়ান্ত করা হয়। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন,

"বিয়াল্লিশের আন্দোলনে কংগ্রেস যেমন 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'-র চূড়ান্ত স্লোগান দিয়েছিল, লিগও তেমনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে শেষ যুদ্ধের স্তরে নিয়ে যাবার সংকল্প নেয়। কংগ্রেসের স্লোগানই ফিরে আসে লিগের ঘোষণায়। কংগ্রেসকে দিয়ে হিন্দু সরকার গঠন করানো হলেই মুসলমানদের সংগ্রাম শুরু হয়ে যাবে..."<sup>৫</sup>

১৬ আগস্ট থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত চলল ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। ১৬ আগস্ট ময়দানে লিগের সভায় সোহরাবর্দি জানিয়ে দেন যে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর ব্যাপারে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করা আছে। এই ঘোষণা দাঙ্গায় প্রত্যক্ষ প্ররোচনা দেয়।<sup>৬</sup> মানিকতলা, রাজাবাজার, ট্যাংরা, টালিগঞ্জ, খিদিরপুর, পার্কসার্কাস, মৌলালি প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলিম লিগের জোরপূর্বক তাণ্ডব চলতে থাকে। অন্যদিকে কংগ্রেসের হিন্দুত্ববাদী অংশ ও হিন্দু মহাসভা যবন নিধন যজ্ঞে নেমে পড়েছিল। প্রথম দিনেই হিন্দু-মুসলিম উভয়ধর্মের ৫৮৩ জন আক্রান্ত হয়। সরকারি হিসেবে মৃত ১০০ জন। ১৭ আগস্টে আহত ১৬০০ জন এবং নিহতের সংখ্যা প্রায় ৩০০ জন। ২৬ আগস্টের মধ্যে কলকাতা-হাওড়ার রাস্তা-নর্দমা থেকে প্রায় ৩৫০০ জনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। আহতের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার হাজার। দেড় লক্ষ মানুষ শহর ত্যাগ করেছিল এবং নব্বই হাজার লোক আশ্রয়শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল।<sup>৭</sup> কলকাতার দাঙ্গা শেষ হয়েও শেষ হয়নি। দাঙ্গার ধিকিধিকি আগুনে ১৯৪৭ সালে মার্চ-এপ্রিলে কলকাতায় মারা গেলেন ৬০ জন। মে মাস পর্যন্ত ১৭টি দাঙ্গায় ৪০ জনের মৃত্যু ঘটে।<sup>৮</sup>

কলকাতার দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়ে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি, কুমিল্লা, খুলনা, সন্দীপ এলাকায়। নোয়াখালি অঞ্চলের অধিকাংশ কৃষক মুসলিম হলেও জমিদাররা ছিল মূলত উচ্চবর্ণের হিন্দু। ফলে অর্থনৈতিক সমস্যা ধর্মবিদ্বেষের রূপ নেয়। নোয়াখালির দাঙ্গা ছিল একতরফা এবং নৃশংসতায় কলকাতাকেও ছাড়িয়ে যায়। তারপর দাঙ্গার আগুন চক্রবৃদ্ধি হারে ছড়িয়ে পড়ে বিহার ও পাঞ্জাবে।

ধারাবাহিক দাঙ্গায় নরহত্যার পৈশাচিকতা ও নারী নির্যাতনের বিস্তৃত বিবরণ মনুষ্যত্বকে ভারাক্রান্ত করে তোলে।

কমিউনিস্ট পার্টি দাঙ্গার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই জনতাকে কংগ্রেস ও লিগের ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনা থেকে মুক্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি লিগকে 'প্রতারক' এবং কংগ্রেসকে 'ব্রিটিশের হাতের ক্রীড়নক' বলে চিহ্নিত করেছিল।<sup>৯</sup> কমিউনিস্ট পার্টি মনে করেছিল,

"ভারতের ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে কংগ্রেস এবং লিগের যখনই একটা রফা হয় তখনই একবার করে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বাঁধে।"<sup>30</sup>

#### স্বাধীনতা—দেশভাগ ও উদ্বাস্ত পরিস্থিতি :

ক্যাবিনেট মিশনের ঘৃণ্য চক্রান্ত, কংগ্রেসের অহমিকা এবং মুসলিম লিগের দ্বিজাতিতত্ত্বের ভেদমূলক পাকিস্তান প্রস্তাব দেশভাগকে অনিবার্য করে তুলেছিল। প্রয়োজন ছিল শুধু জনগণের সম্মতি। ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও তার পরবর্তী ঘটনাবলি দুই সম্প্রদায়ের মানুমের মনে যে ঘৃণার বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল তাতে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল দেশভাগ এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। দাঙ্গার রূপ ও প্রধানমন্ত্রী সোহরাবর্দির ভূমিকা দেখার পর নিরাপত্তাজনিত কারণে হিন্দু বাঙালি দেশভাগের প্রস্তাবকে মেনে নিয়েছিল। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগুরু মুসলিম কৃষকদের মনে হয়েছিল দেশভাগ হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার থেকে তাদের মুক্তি দেবে।<sup>25</sup> এই অস্থির পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে ভারতবর্ষে পা রাখলেন নতুন ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন।

১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপিডেন্স অ্যাক্ট' পাশ হয়। প্রাথমিকভাবে ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা হলেও পরে স্বাধীনতার দিন ঘোষণা করা হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট।<sup>১২</sup> ১৪ আগস্ট গভীর রাত্রে ভারতবর্ষের নতুন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করলেন স্বাধীন ভারতের মহামন্ত্র:

"At the Stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom." $^{30}$ 

অবশেষে দীর্ঘ দুশো বছরের পরাধীনতার অন্ধ কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পালা। শুরু হল এক নতুন যাত্রাপথ—যার নাম স্বাধীনতা। নতুন স্বপ্ন, নতুন আশা মানুষের মনে আনন্দের কল্লোল তুলেছিল। কিন্তু সেই রাতের অন্ধকার লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে আর কখনই ভোরের সন্ধান নিয়ে আসেনি। সমগ্র উপমহাদেশ যখন নেহরুর ঐতিহাসিক ভাষণ উদযাপনের আনন্দে মত্ত, তখন পাঞ্জাব ও বাংলার মানুষ ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় আশঙ্কিত। দুই বঙ্গে রয়ে যাওয়া সংখ্যালঘু মানুষদের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো রাজনৈতিক দলই চিন্তা করেনি। সব রাজনৈতিক দলই সেদিন ভারতবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টিও মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে মুসলিম লিগ প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গসহ পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল,

"কমিউনিস্ট পার্টিই একমাত্র পার্টি যে মুসলিম লিগের পাকিস্তানের দাবিকে ন্যায্যদাবি বলিয়া মানিয়া লইয়াছে এবং মুসলিম লিগকে আহ্বান করিতেছে কংগ্রেস-লিগ-কমিউনিস্টদের মিলিত অভিযানের ভিতর দিয়া পাকিস্তানের মূল লক্ষ্য সফল করিতে।"<sup>38</sup>

দেশভাগ সম্পন্ন হল, শুরু হল উদ্বাস্ত প্রবাহ। লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে পাড়ি দিল নতুন দেশের উদ্দেশ্যে। দাঙ্গাজনিত নিরাপত্তার আতঙ্ক, শাসনব্যবস্থায় হিন্দুদের অনুপস্থিতি, পুলিশ-প্রশাসনের নিশ্চেষ্টতা, খাদ্য ও অর্থনৈতিক সংকটের ফলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে 'পাকিস্তান' শব্দটি উচ্চারিত হওয়া মাত্রই এক শ্রেণির মুসলিম দেশটিকে স্বেচ্ছাচারিতার আখড়া করে তুলেছিল। হিন্দু বিতাড়নের মধ্যে দিয়েই পাকিস্তান স্বর্গোদ্যান হয়ে উঠবে এরকম ভ্রান্ত আত্মবিশ্বাস তাদের অত্যাচারের প্রবণতা বাড়িয়ে তুলেছিল। কৃষক-জমিদার ভূমি সম্পর্কের দ্বন্দ্ব সাম্প্রদায়িক মোচড় নেওয়ায় উচ্চবিত্ত হিন্দুরা দেশত্যাগ করেছিল। তাদের কৃতকর্মের দায়ভার বহন করতে হয়েছিল নিম্নবর্গ ও মধ্যবিত্ত হিন্দুদের। স্বাধীনতার স্বাদ ক্রমশ তিক্ত হয়ে তারা বাস্তত্যাগের মতো নির্দয় সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল। তারা ভেবেছিল নেহরু সরকার এবং 'হিন্দু'

\$88

ভাইদের আন্তরিক অভ্যর্থনায় আবার সুস্থ স্বাভাবিক জীবন গড়ে তুলবে। এই আশাতেই তারা দেশত্যাগের জন্য পা বাড়িয়েছিল। তারা এসে পেল শিয়ালদহ স্টেশনের 'নরকের সিংহদ্বার'<sup>১৫</sup> এবং অন্ধকার ক্যাম্পে নিঃস্পন্দ মৃত্যুর অধিকার।

# ১৯৫০-এর দাঙ্গা ও কমিউনিস্ট পার্টি :

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে নিজামশাসিত স্বাধীন হায়দরাবাদকে ভারতবর্ষে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ভারত সরকার সামরিক অভিযান চালায়। ভারতের আভ্যন্তরীণ ঘটনার পরিণাম ভুগতে হল পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ হিন্দু-জনতাকে। ১৯৫০ সালে খুলনা জেলার বাগেরহাট অঞ্চলে পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ থেকে দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। কিছুদিনের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে ময়মনসিংহ, চিত্তগঞ্জ, সিলেট, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে। 'বাগেরহাট দাঙ্গা' আদতে হিন্দু গণহত্যায় পরিণত হয়েছিল। যার প্রতিক্রিয়ায় কলকাতা ও হাওড়া অঞ্চলে শুরু হয় মুসলমানদের উপর একতরফা আক্রমণ। ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গার আবহ ছড়িয়ে পড়ে। থিতু হয়ে আসা উদ্বাস্ত স্রোতের গতিতে পুনরায় জোয়ার আসে। এবারের উদ্বস্ত শ্রোত ছিল দ্বিমুখী।

১৯৫০ সালে দু'বঙ্গের দাঙ্গার জন্য শুধুমাত্র প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি দায়ী ছিল না। পাশাপাশি রাষ্ট্রশক্তি ও পুঁজিবাদী শক্তিগুলিও নিজেদের স্বার্থের জন্য দাঙ্গার আবহাওয়াকে জিইয়ে রাখতে চেয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে শ্রমিক আন্দোলনে ভাঙন নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মূল দুশ্চিন্তা ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি তখন রণদিভে প্রবর্তিত 'ঝুটা স্বাধীনতা'-র বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করছিল। যার ফলে দলের মধ্যে অসংখ্য মতানৈক্য ও সংঘাতের সৃষ্টি হয়। সহকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ভ্রান্ত নেতৃত্ব, রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের ফলে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন বৃত্তচ্যুত হয়ে পড়ে। যে-কটি গণসংগঠন সক্রিয় ছিল দাঙ্গার আঘাতে সেগুলিও চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যায়। অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে শ্রমিক-কৃষকরা মিলিতভাবে দাঙ্গাকে প্রতিরোধ করেছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি সেদিন সার্বিকভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক কর্তব্য পালন করতে পারেনি।
উদ্বাস্তু তরঙ্গ প্রবাহ :

স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষে উদ্বাস্ত আগমনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় ভারতবর্ষের দু'প্রান্ত জুড়ে ১ কোটি ২০ লক্ষ পরিবার গৃহচ্যুত হয়।<sup>১৬</sup> ১৯৪৬-এ নোয়াখালি দাঙ্গার পর কলকাতায় শরণার্থী সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০০০ এবং ত্রিপুরায় ৫০০০।<sup>১৭</sup> তারপর থেকে উদ্বাস্ত স্রোত আর বন্ধ হয়নি। স্বাধীনতার পর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে প্রায় ৯ লক্ষ মানুষ উভয় পাকিস্তান থেকে ভারতে প্রবেশ করে।<sup>১৮</sup> ১৯৪৮-এর জুলাই মাসের মধ্যে সেই সংখ্যাটা দাঁড়ায় ১২ লক্ষে।<sup>১৯</sup> আগত উদ্বাস্তর সংখ্যা আগস্ট মাসে ১৯০০০, সেপ্টেম্বর মাসে ১৮০০০। বছরের শেষে উদ্বাস্ত শিবিরে আশ্রয় নেয় ৪০ হাজার মানুষ। ১৯৪৯ সালে সরকারি শিবিরে আশ্রয় নেয় প্রায় ৭০০০০ মানুষ।<sup>২০</sup> ১৯৪৮ পর্যন্ত আগত ১১ লক্ষ মানুষের মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ ছিলেন শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির, সাড়ে পাঁচ লক্ষ মানুষ ছিলেন গ্রামীণ মধ্যবিত্ত, এক লক্ষ মানুষ ছিলেন কৃষক ও কারিগর শ্রেণির।<sup>২১</sup>

১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের মধ্যে 'নেহরু-লিয়াকত চুক্তি' চুক্তি সাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে দুই দেশের সরকার সংখ্যালঘুদের জীবন, সংস্কৃতি, বাক্স্বাধীনতা, আইনি অধিকার ও সম্পত্তি রক্ষার পূর্ণ দায়ভার গ্রহণ করবে। পাশাপাশি দুই রাষ্ট্রই উদ্বাস্তদের ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। এই চুক্তি অনুসারে ১৯৫০-র ডিসেম্বরের মধ্যে যারা ফিরে যাবে, তারা স্থাবর সম্পত্তি ফিরে পাবে। কিন্তু চুক্তির ফলে উদ্বাস্ত হিন্দুদের তুলনায় উদ্বাস্ত মুসলিমরা অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিল। ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে নেহরু সরকার ঘোষণা করে যে তারা উদ্বাস্তদের ত্রাণের দায়িত্ব নিলেও পুনর্বাসনের দায়িত্ব নেবে না। প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর মতে,

"উদ্বাস্তরা পালিয়ে আসছিল না। তাদের বিতাড়িত করা হচ্ছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রীই পালিয়ে যাচ্ছিলেন। সমস্যার মোকাবিলা করার সাহস ছিল না তাঁর।"<sup>২২</sup>

১৯৫১-তে খুলনায় খাদ্যসংকটের পর হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষই পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন। ১৯৫২-তে ভারত-পাকিস্তানে যাতায়াতের জন্য পাসপোর্ট প্রথা চালু হয়। এতদিন পর্যন্ত বহু

মান্যবের মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল হয়তো একদিন ধর্মীয় বিভাজন ভুলে দ-দেশ আবার একত্রিত হবে। পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু হওয়া মাত্রই মানুষের সেই বিশ্বাস ভেঙে যায়। ফলে নতুন করে উদ্বাস্তম্রোত শুরু হয়। ১৯৪৯-এ উদ্বাস্ত জনপ্রবাহ একটু কমলেও ১৯৫০-এ বাগেরহাট দাঙ্গা, নেহরু-লিয়াকত চুক্তির কারণে পুনরায় জনস্রোত শুরু হয়। ১৯৫০-এর এপ্রিল থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে ৪,৬০,৬১০ জন হিন্দু পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১-র জানয়ারি পর্যন্ত ৩৫ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্ত হয়ে পড়েন। যা বাংলার তৎকালীন জনসংখ্যার প্রায় এক দশমাংশ। অবশ্য পূর্ববঙ্গে মুসলিম উদ্বাস্তর সংখ্যাও কম ছিল না। কিন্তু নেহরু-লিয়াকত চুক্তির পরে একটা বড়ো অংশের মুসলিম মানুষ পুনরায় ভারতে ফিরে আসেন। ১৯৫১-তে উদ্বাস্তর সংখ্যা ছিল ৭৯,৮০০ এবং ১৯৫২-তে ১,২৭,০০০, ১৯৫৫-তে ২,০৯,৫৭৩।<sup>২৩</sup> ছয়ের দশকে আবার নতুন করে উদ্বাস্ত আগমন শুরু হয়। ১৯৬১-৬৫ সালের মধ্যে কমপক্ষে দশ লক্ষ হিন্দু বাঙালি পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। বিশেষ করে ১৯৬২ সালের পাবনা-রাজশাহির দাঙ্গা এবং ১৯৬৪-তে ঢাকার দাঙ্গায় সংখ্যালঘুদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা হয়।<sup>২8</sup> যার প্রভাবে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলির দখল দুষ্কৃতিদের হাতে চলে যায়। ১৯৬৪-র দাঙ্গার প্রথম দিনে সমগ্র জেলায় ১৮ জন হিন্দু ও ১০৮ জন মুসলমানের মৃত্যু হয়েছিল।<sup>২৫</sup> অথচ ১৯৬৪-র দাঙ্গার সঙ্গে কলকাতা ও পূর্ব-পাকিস্তানের সংযুক্ত হওয়ার কোনো আশু কারণ ছিল না। কিন্তু সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির চক্রান্ত ও প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় প্ররোচনায় দৃ'বঙ্গেই দাঙ্গা শুরু হয়।

### উদ্বাস্ত জীবন এবং বাস্তহারা সংগ্রাম :

লক্ষ লক্ষ বাঙালি যারা জন্মভিটে ছেড়ে এক নতুন দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিল, তাদের ঠিকানা কী হল? বনগাঁ বা দর্শনা থেকে 'বর্ডার স্লিপ' নামক অভিজ্ঞান পত্র সংগ্রহ করে তারা চলে আসত শিয়ালদহ স্টেশনে। প্লাটফর্মের কিছুটা জায়গা দড়ি ঘিরে ছয় হাজার মানুষের নতুন দেশ। ওই জায়গাতেই পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে রান্না, খাওয়া, ঘুম ও শৌচকর্ম। বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরা এসে চিঁড়ে, গুড়, দুধের ব্যবস্থা করে দিত। কারোর চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, জীবনের নিরাপত্তা

নেই, জীবিকার তো প্রশ্নই ওঠে না। তার মধ্যে কিছু মানুষ 'বন্ধু' সেজে এদের সামান্য অর্থনৈতিক সম্বল কেড়ে নিয়েছে। কলকাতা শহরের অন্ধগলির ঘেরাটোপে হারিয়ে গেছে কত যুবতী মহিলা।

তৎকালীন ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের কমিশনার হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় শরণার্থীদের তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছিলেন,

"যারা উদ্যমশীল এবং তুলনায় অবস্থাপন্ন তারা সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে, সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছিল। যারা তুলনায় তত অবস্থাপন্ন নয় অথচ উদ্যমশীল, তারা সরকারের আশ্রয় শিবিরে না গিয়ে পরিত্যক্ত বা খালি বাড়িতে বা পতিত জমিতে অস্থায়ী বাসের ব্যবস্থা করে নিজেদের জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করেছিল। আর এক শ্রেণির উদ্বাস্ত ছিল যারা দরিদ্র এবং যাদের এমন মনের বল নেই যে আংশিক ভাবেও নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে পারে। এঁরাই সরকারের আশ্রয় শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।"<sup>২৬</sup>

নদীয়ার রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প, ধুবুলিয়া ও বিভিন্ন অস্থায়ী ট্রানসিট ক্যাম্প ছিল এদের আদি-বাসস্থান। ১৯৫৫ পর্যন্ত আগত উদ্বাস্তদের ২৫ শতাংশ এই ক্যাম্পগুলিতে জীবন কাটাচ্ছিল। এদেরকে আদৌ পুনর্বাসন দেওয়া হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নিতে সরকারের দশ বছর কেটে যায়।

'নগ্নতা, ক্ষুধা ও মৃত্যু'—প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী ব্যবহৃত এই তিনটি শব্দ সরকারি ক্যাম্পের উদ্বাস্ত জীবনকে যথার্থভাবে প্রকাশ করে।<sup>২৭</sup> একটা সময়ে রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পে উদ্বাস্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ৭০০০০। কোনো জীবন নেই, জীবিকা নেই, কর্ম নেই, উৎসাহ নেই, স্বপ্ন নেই। অসুস্থতায়, চিকিৎসাহীনতায়, বিষক্রিয়ায় বহু মানুষ মারা যেত। ইউসিআরসি নেতৃবৃন্দের একটি দল কাশীপুর সরকারি ক্যাম্পে গিয়ে রান্নাঘরের পিছনে ডাঁই করে রাখা মৃতদেহ দেখতে পান।<sup>২৮</sup> কখনও শিয়াল-কুকুরে এসে শিশুদের তুলে নিয়ে যেত, কখনও বা সৎকারের অভাবে মৃত শিশুদের জঙ্গলে ফেলে আসা হত। প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর মতে,

"যখন তারা যাত্রা শুরু করেছিল, তারা মানুষ ছিল। এখন তারা সরকারি ক্যাম্পের আবয়বী অন্ধকারের মধ্যে নিজেদের মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত।"<sup>২৯</sup>

ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা ছিল ন্যক্বারজনক। অথচ একই সময়ে পাঞ্জাবের উদ্বাস্তদের জন্য প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা কেন্দ্রীয় সরকারের বৈমাত্রীয় সুলভ আচরণ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। স্পষ্টতই আমরা যাকে 'উদ্বাস্তু সমস্যা' বলে অভিহিত করি, তা আসলে উদ্বাস্তদের নিয়ে নীতি ও পরিকল্পনার সমস্যা। বাংলার অর্থনীতি, ভূমি-রাজনীতিতেও যার ব্যাপক প্রভাব পড়ে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী পাঁচের দশকের শেষে ২,৩৪,০০০ বাঙালি বেকারের মধ্যে ৭০,০০০ উদ্বাস্তু পরিবারের।<sup>৩০</sup>

উদ্বাস্তদের মধ্যে যাদের শক্তি, সাহস, উদ্যম ছিল তারা নিজেদের প্রচেষ্টায় নিজেদের পুনর্বাসন দিয়েছিল। তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক মতপার্থক্য ছিল, কিন্তু তারা দলীয় স্বার্থকে উদ্বাস্ত পরিচয়ের আগে প্রাধান্য দেয়নি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, শুভানুধ্যায়ী তাদের অধিকারের স্বার্থে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৪৮-এর শেষের দিকে 'নিখিলবঙ্গ বাস্তহারা কর্মপরিষদ' নামে একটি সংগঠন তৈরি করা হয়। ১৯৪৯ সালের ১৪ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কলকাতায় এলে শিয়ালদহ স্টেশনে ১৫০০০ উদ্বাস্ত জনতা সমবেত হয়। সেখানে মিটিং-এর পর ২০০০ জনতা ১৪৪ ধারা ভেঙে নেহরুর কাছে দাবিপত্র পেশ করতে গেলে পুলিশ লাঠি, টিয়ার গ্যাস চালায়। ১৮ জানুয়ারি এই ঘটনার প্রতিবাদে আয়োজিত মিছিলে পুলিশের গুলিচালনায় ১০ জন নিহত হয়।<sup>৩১</sup> ১৯৫০ সালে তৈরি হয় 'সংযুক্ত বাস্তহারা পরিষদ' বা United Central Refugee Council (UCRC)। প্রথম সম্পাদক হন চট্টগ্রাম আন্দোলনের নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী।

ততদিনে উদ্যমী উদ্বাস্তরা নিজেদের মতো করে পতিত এলাকা ও পোড়ো বাড়িগুলি দখল করে জবরদখল কলোনি গড়ে তোলা শুরু করে। যতবার উদ্বাস্তরা কলোনি তৈরি করেছে, ততবার জমির মালিকরা গুগু, লাঠিয়াল বা পুলিশের সাহায্যে তাদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছে। ১৯৫১ সালে সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 'উচ্ছেদ আইন' জারি করে। এই আইনের বলে জমির মালিক ৫০

পয়সা কোর্ট ফি দিয়ে জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে। জবরদখলের জন্য সরকার মালিককে ক্ষতিপূরণ দেবে এবং রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করে জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।<sup>৩২</sup>

১৯৫৩ সালের মনুমেন্টের সভা থেকে ইউসিআরসি-র নেতৃবৃন্দ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরেন। যার মধ্যে সরকারি পুনর্বাসন নীতির পুনর্মূল্যায়ন, সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন, উদ্বাস্তদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে জমির দাম নির্ধারণ, উচ্ছেদ আইন বাতিল করা, কলোনিগুলিকে স্বীকৃতিদান, পোড়োবাড়িগুলির বিকল্প বাসস্থান অন্যতম ছিল।<sup>৩৩</sup> ইউসিআরসি-র বহুদলীয় আদর্শের সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও পার্টি আন্দোলনের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। ট্রাম আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে উদ্বাস্তদের যোগদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠন নয়, জয়ী হয়েছিল বাস্তহারাদের মরণপণ সংগ্রাম।

গণনাট্য সংঘ, বাংলা নাট্যমঞ্চ এবং সাম্প্রদায়িকতা :

গণনাট্য সংঘ বাংলা নাট্যমঞ্জের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী অবস্থানের ঐতিহ্য দায়িত্বের সঙ্গে বহন করেছিল। ১৮৭২ সালে বাংলা নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠালগ্নে ন্যাশনাল থিয়েটার দ্বারা অভিনীত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে নীলচাযের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান একতা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শ উদাহরণ ছিল। হিন্দু রমণীর সম্মান রক্ষার্থে মুসলিম চাষি তোরাপের সাহসী প্রতিবাদ কিংবা মুসলিম কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় হিন্দু জমিদারের আত্মত্যাগে গড়ে ওঠা বাংলার খোঁজ স্বার্থান্ধ রাজনীতিবিদরা কখনই পাবে না। অবশ্য এটাও স্মরণীয় যে বাংলা নাট্যমঞ্চ দীর্ঘসময় নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল হিন্দু-জাতীয়তাবাদের দ্বারা। গিরিশচন্দ্রের ধর্মচেতনার নাটকগুলির সম্প্রীতির কথা এসেছে হিন্দু জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের কালে মুসলিম জনতাকে সপক্ষে টেনে আনার প্রয়োজনীয়তা বাংলা নাটমঞ্চেও ফুটে ওঠে। তিনের দশকে স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত মুহূর্তেও

এই প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। বিভিন্ন সময়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় থেকে মন্মথ রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটকে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিহ্ন উঠে এসেছিল।

## হোমিওপ্যাথি :

গণনাট্য সংঘের মঞ্চে ১৯৪৪ সালের ৩ জানুয়ারি 'মহর্ষি' মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের লেখা 'হোমিওপ্যাথি' নাটকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা প্রচারিত হয়। একাঙ্ক নাটকটির ঘটনাস্থল পূর্ববঙ্গের পূর্বাঞ্চলের একটি গ্রামের রাস্তা। জাপানি বোমার ভয় এবং মহামারির মধ্যেও গ্রামের হিন্দু-মুসলমান জনতা কুসংক্ষার-গোঁড়ামি আঁকড়ে বসে থাকে। এআরপি-র নিবারণ ডাক্তার ও তাঁর কম্পাউন্ডার পাগলা জগাই মহামারির বিরুদ্ধে সীমিত সামর্থ্যে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করে। কিন্তু যাদের জন্য তাঁদের লড়াই, সেই অন্ধ গ্রামবাসী তখন পচাডোবার জল খাচ্ছে। হিন্দুদের বিশ্বাস কীর্তন করলে কলেরা চলে যাবে। মুসলিমরা ভাবছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সকল রোগের মহৌষধ। তাঁদের ধর্মান্ধতা মড়কের থেকেও বড়ো শত্রুকে ডেকে নিয়ে আসে—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সেই সময়ে জাপানি বোমার আক্রমণের সতর্কধ্বনি শুনে প্রাণভয়ে কেউ মন্দিরে, কেউ মসজিদে আশ্রয় নেয়। বোমাতঙ্ক কাটলে দেখা যায় অনেক হিন্দু মসজিদে, অনেক মুসলমান মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিল। "দাঙ্গার ওষুধ বোমা!"<sup>৩৪</sup> গ্রামের মানুষ বুঝতে পারে তাদের পারস্পরিক বিবাদ ভুলে এক বড়ো শত্রুকে প্রতিহত করতে হবে। স্বেচ্ছাসেবকদের আগমনে তারা মড়ক আর বোমা দুই ফ্রন্টে লড়াই-এর শপথ নেয়।

নাটককারের উদ্দেশ্য ছিল দাঙ্গা ও মড়কের মতো দুটি ভিন্নমুখী দ্বন্দ্বকে জাপানি বোমার সূত্র ধরে একটি নির্দিষ্ট অভিমুখ দেওয়া। ঘটনার অভিঘাতে সেই উদ্দেশ্য সফল হলেও শেষে জাপবিরোধী গান, স্বেচ্ছাসেবকদের বক্তব্য, নিবারণ ডাক্তারের চিনের ইতিহাস বর্ণনা প্রভৃতি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আগমন নাটকটিকে হঠাৎই প্রচারপ্রধান করে তোলে।

নবান্ন :

১৯৪৪ সালে প্রযোজিত বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের শেষে দুর্ভিক্ষের ক্রন্দন ভুলে হিন্দু-মুসলমান সকলেই আনন্দোৎসবে মেতে উঠেছিল। দুর্ভিক্ষ যেমন ধর্ম-বিচার করে আসেনি, তেমনই উৎসবের দিনেও গ্রামবাংলার কৃষক শ্রেণির কাছে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। মোরগের লড়াইয়ে ফেকু মিঞার মোরগ জেতার পর তাকে একটা গামছা ও একটা কান্তে উপহার দেওয়া হয়। তারপরে আমরা দেখি,

"ফেকু মিঞা হাসি মুখে দু'হাত পেতে উপহার নিল। সকলে তখন আবার তুমুল হর্ষধ্বনি

করে ফেকু মিঞাকে সর্বজন সমক্ষে উঁচু করে ধরল।"<sup>৩৫</sup>

গরু দোঁঁড়ে প্রথম হয় রহমৎউল্লার গরু। উপহার হিসেবে রহমৎউল্লার হাতে একটি নতুন কাপড় ও একটি লাঙল তুলে দেয় দয়াল মণ্ডল। কে জানত কয়েক বছর পরেই দুর্ভিক্ষ-বিধ্বস্ত আমিনপুর থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে বসে থাকা কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তি তাদের স্বার্থবুদ্ধির জন্য ফেকু মিঞা, প্রধান, রহমৎউল্লা, দয়াল মণ্ডলদের একে অপরের শত্রু করে তুলবে? শুধু গণনাট্য সংঘ নয়, সমমনোভাবাপন্ন দল ও ব্যক্তিদের নাটকেও উঠে এসেছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' ও 'ছেঁড়া তার' নাটক। কিন্তু বিশ শতকের চারের দশকের প্রথমার্ধে দ্বিজাতি তত্ত্বের বীজ তখনও সাধারণ জনতার অন্ধকার প্রকোণ্ঠে শিকড় গেঁড়ে বসতে পারেনি। অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হলেও ছেচল্লিশের দাঙ্গা বা দেশভাগের কল্পনা কেউ দুঃস্বপ্নেও করতে পারেনি। ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চেতনা প্রচার করা সহজ ছিল। কিন্তু দেশভাগের পর সম্প্রীতির বাণী প্রচারের পাশাপাশি দাঙ্গা প্রতিরোধের প্রস্তুতি সংগঠিত করার প্রয়োজন ছিল। গণনাট্য সংঘের তূণে স্বথেকে বড়ো অন্ত্র ছিল শ্রোণিসংগ্রাম। কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের পাকেচক্রে গণনাট্য সংঘে সেই অস্ত্র প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছিল।

#### দেশভাগের নাটক—'বাস্তুভিটা' :

দেশভাগ আর উদ্বাস্ত —ইতিহাসের ধারাপাতে দুটি শব্দ সমার্থক হয়ে গেছে। কিন্তু তারও ব্যতিক্রম আছে; হিন্দু-মুসলিম মানেই পরস্পর যুযুধান শত্রুপক্ষ নয়, অনেক ক্ষেত্রেই উভয় ধর্মের মানুষ সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা অতিক্রম করে মনুষ্যত্বের জয়ধ্বজা উড়িয়েছে। এ কথা সত্যি যে মুসলিমদের অত্যাচারসহ আরও অসংখ্য কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুত্যাগ করে অকূলের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল। তেমনই প্রাথমিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত সামলে বহু মানুষ পূর্ব-পাকিস্তানে থেকে গিয়েছিল। স্বাধীনোত্তর সময়ে গণনাট্য সংঘের অন্যতম অগ্রণী নাট্যকার ও সংগঠক দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'বাস্তুভিটা' নাটকে এরকম ঘটনাই আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। একদিকে যখন গ্রামকে গ্রাম মানুষের দেশত্যাগ করার হুজুগ, তখন নাটকের মহেন্দ্র মাস্টারকে মুসলিম জনগণ আন্তরিকতার বেড়াজালে আটকে দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পের এই যন্ত্রণা চিরকালীন সত্য নয়—সত্য মানুষের প্রতি বিশ্বাস আর ভালোবাসা। "তিনি হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বকে দুই শত্রুর দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখাননি—আত্মাভিমানী দুই প্রতিবেশীর দ্বন্দ্ব হিসেবেই চিত্রিত করেছেন।"<sup>৩৬</sup>

সাত দৃশ্যে বিস্তৃত নাটকটি শুরু হয় দেশত্যাগের জ্বলন্ত পটভূমিকাকে সামনে রেখে। চৌধুরী, মুখার্জি, মিত্তিররা ভিটে বেচে পালিয়ে যাচ্ছে। মহেন্দ্র মাস্টারের স্ত্রী মানদাও অবিলম্বে দেশত্যাগ করে কলকাতা চলে যেতে চায়। কিন্তু মহেন্দ্র মাস্টার দেশত্যাগের কথা ভাবতেই পারেন না। মহেন্দ্র মাস্টার ও তাঁর বন্ধু আমীন মুঙ্গি বোঝেন পাকিস্তানি রাষ্ট্রব্যবস্থা মুসলিমদের উন্নতির জন্য চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেললেও তারা আসলে উভয়ধর্মেরই শক্রু। প্রাক্তন লিগকর্মী আমীন মুঙ্গি বলেই ফেলে "ও পাকিস্তান না ফাঁকিস্তান। এতদিন যারা উজিরি করেচেন তাঁরাই তো পাকিস্তানের মালেক হবেন, গরিবের তাতে কী?"<sup>৩৭</sup> এর থেকে বড়ো সত্যি কথা আর কিছু হতে পারে না। মহেন্দ্র মাস্টার নিজে হয়তো দেশত্যাগ করে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে পারবেন, কিন্তু যে বিরাট সংখ্যক জেলে, তাঁতি, কামার, কুমোরকে জাতের নামে বজ্জাতি সহ্য করতে হবে তাদের উপায় কী হবে?

তিনি সোনা মোল্লার কাছে তার ছেলেদের কুকীর্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে গেছিলেন। সেই আলোচনা আকস্মিকভাবেই দেশ-কাল-সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। অসুস্থ সময়ের লক্ষণ এরকমই হয়। এ-কথা ঠিক যে এককালে হিন্দুদের অতিরিক্ত সংস্কার ও গোঁড়ামির কারণে মুসলিমদের বিভিন্ন অন্যায় সহ্য করতে হয়েছে। ভূমি সম্পর্কের দ্বন্দ্বের কারণে পূর্ববঙ্গের মুসলিম কৃষকদের যুগের পর যুগ ধরে অত্যাচারিত হতে হয়েছে।

"মহেন্দ্র : আপনাদের তো যত আক্রোশ হিন্দু জমিদারদের ওপর। অত্যাচারী মুসলমান জমিদারদের বিরুদ্ধেও দাঁড়ান—দেখবেন সমস্ত গরিব আপনার পেছনে!

সোনা : ওটা কেবল মুখের কথা মাস্টার।... আসলে কথা কী জানো—এতকাল যারা তোমাদের উপেক্ষা পেয়ে এসেচে, আজ তারা রুখে দাঁড়াতে চায় বলে তোমাদের ভালো লাগছে না, মনে হচ্ছে বাড়াবাড়ি। পরের কথায় নেচো না মাস্টার, নিজের ক্ষতি হবে। আঘাত দিলে পাল্টা আঘাত আসবেই। দিনকয়েক একটু সহ্য করতে হবে।"<sup>%</sup>

সোনা মোল্লার বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় পাকিস্তানের জন্ম আজ মুসলিমদের প্রতিবাদ করার আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে এক অন্ধ অহংকারের জন্মও দিয়েছে। যার শিকার হতে হচ্ছে সৎ, নিরপরাধ মহেন্দ্র মাস্টার ও তাঁর পরিবারকে।

মহেন্দ্র মাস্টারকে ক্রোধাম্বিত করেছিল তাঁর মেয়ের নিরাপত্তার অভাব। সোনা মোল্লার ছেলেদের দ্বারা কমলাকে মানসিকভাবে নির্যাতিত হতে হয়েছিল। তিনি সে বিষয়ে অভিযোগ করেছিলেন সোনা মোল্লার কাছে। যার উত্তরে সোনা মোল্লা এক অডুত নিরাসক্ত কণ্ঠে জানিয়েছিলেন যে এসব বয়সের ধর্ম। অথচ দু'বঙ্গেই দাঙ্গার বীভৎসতা নারীদের উপর অত্যাচার ও লাঞ্ছনাকে কোন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল তা সোনা মোল্লার অজানা থাকার কথা নয়। সোনা মোল্লা মহেন্দ্র মাস্টার বা তার পরিবারকে আঘাত করতে চাননি। তাঁর মধ্যে কাজ করেছিল নির্যাতিতের মানসিকতা এবং সাম্প্রদায়িক আত্মপ্রতিষ্ঠার অহং। যা তাঁর মানবিক চেতনাকে অবশ করে দিয়েছিল।

সোনা মোল্লার অতীতে নির্যাতিত হওয়ার ঘটনা তাঁকে আজীবন বিব্রত করেছে। বহু যুগ আগে তার ধর্মপরিচয়ের জন্য তিনি শচীনের পূর্বপুরুষদের দ্বারা মানসিকভাবে অত্যাচারিত হয়েছিলেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রশ্ন। শচীনের বাবা ছিলেন তাঁর বন্ধু, একই সঙ্গে তাঁদের বড়ো হয়ে ওঠা। অথচ যুগ যুগ ধরে প্রবহমান সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য দু'জনের জীবন দুদিকে বয়ে গেছে। তিনি শচীনকে বলেন,

"কলকাতায় গিয়ে তিনি অনেকগুলো পাশ দিয়ে উকিল হলেন। আর আমি, চাষির ছেলে, এসে হালগুরু ধরতে হল। তবে সত্যি কথা বলতে কি, আমি যতবার কলকাতায় গিয়েচি— তোমার বাবার কাছে সেই ছেলেবেলার মতোনই ব্যবহার পেয়েচি। কিন্তু তবু বলচি, সেই কচি বয়েসের আঘাত এমনভাবে মনে দাগ কেটে গিয়েছিল যে জীবনে সে দাগ আর কিছুতেই মুছল না।"<sup>৩৯</sup>

এই আঘাতের দাগ থেকেই তাদের মধ্যে দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ রোপিত হয়েছিল। সকলেই হয়তো ঘাতকের পোশাক পরেনি, কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের বাতাস সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। পাকিস্তান তৈরি হওয়ার আগে থেকেই তারা সম্প্রীতির এক নতুন সংজ্ঞা তৈরি করে নিয়েছিল। তাদের মনে হয়েছিল হিন্দু অপসারণের নামই স্বাধীনতা, দমন-পীড়নের নামই রাষ্ট্র-অধিকার। সোনা মোল্লার বক্তব্য পুনরায় তার প্রমাণ দেয়,

"শচীন : ...কারণ দেশকে আমরা কোনো দিনই এভাবে ভাগ করে দেখিনি। তাছাড়া স্বাধীনতার জন্যে আমাদের লড়তে হয়েচে।

সোনা : তুমি বলতে চাও আমরা লড়িনি?

শচীন : লড়েচেন বই কি! তবে বিদেশির সঙ্গে নয়।

সোনা : যে যাকে আজাদির পথে শত্রু বলে মনে করে সে তারই সঙ্গে লড়াই করে।"<sup>80</sup>

'আজাদি' পাওয়ার পরেও সোনা মোল্লা প্রকৃত জাতীয় কর্তব্য নিরসনে দ্বিধান্বিত ছিলেন। হিন্দুদের সম্পর্কে তাঁর মনে হয়েছিল "যারা এতকাল টবের ফুলের মতো এখানে বেঁচেছিল তাদের মনে ভয় ঢুকেচে, যদি গোড়ায় পানি না পড়ে।" অর্থাৎ হিন্দুরা তাদের পুরনো প্রতিপত্তি হারানোর আশঙ্কায় দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। তিনি ভেবেছিলেন যে ভারতের বৃহত্তর অংশের মুসলিমরা হিন্দুদের ভরসা করতে পেরেছিল, এদেশে হিন্দুরা তাঁদের ভরসা করতে পারেনি। তাই তিনি সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলার বিরোধী হলেও হিন্দুদের স্বেচ্ছায় দেশত্যাগের বিরোধী নয়।

হিন্দুদের শিক্ষা দেওয়ার ভ্রান্ত ধারণায় সোনা মোল্লাদের মতো প্রতিনিধিস্থানীয় মুসলিমদের ঔদাসীন্যের কারণে ইয়াসিন মোল্লারা মানুষকে পুনরায় সাম্প্রদায়িক করে তোলার সুযোগ পায়। ইয়াসিন প্রচার করে বেরিয়েছে কেউ যেন হিন্দুদের জমি-বাড়ি না কেনে। তারা ঠিক করেছে রাতে গঞ্জ লুট করে হিন্দু ব্যবসায়ীদের শেষ করে দেবে। সোনা মোল্লা বুঝতে পারেন যে স্বাধীন পাকিস্তানের স্বপ্ন লক্ষ লক্ষ মুসলিম জনতা দেখেছিল, ইয়াসিন মোল্লারা তাকে কট্টর সাম্প্রদায়িক দেশে পরিণত করছে। এবং সেটা তারা করছে ইসলামকে সামনে রেখে। দেরিতে হলেও তিনি বোঝেন যে এভাবে চললে পাকিস্তান রসাতলে যাবে।

"সোনা : পরের ধন যারা লুট করে তারা মহাজনী করে না মিঞা, লুটটাই তাদের পেশা হয়ে দাঁড়ায়।

ইয়াসিন : আশ্চর্য মোল্লাসাহেব! আজকাল আপনার সুরই যেন বদলে গিয়েছে। হিন্দু মহাজনেরা ঘুষ দেয়নি তো?

সোনা : ইয়াসিন মিঞা বোধ হয় ভুলে গেছেন তিনি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলচেন! ইয়াসিন : না, ভুলিনি। আমি জানি, আপনি এই পরগণার মোড়ল। কিন্তু আমরা দশজনেই আপনাকে মোড়ল করেচি। ইসলামের কথা ভুলে গিয়ে আপনি যদি মুছলমানের স্বার্থের বিরুদ্ধে যান আর হিন্দু মহাজনদের তোয়াজ করেন, তবে জানবেন, মোড়লি যেতে আপনার বেশিদিন লাগবে না।"<sup>85</sup>

শচীন আর ইয়াসিন মোল্লা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। পূর্ববঙ্গে জমি বেচতে এসে শচীন মহেন্দ্র মাস্টারের পরিবারকে ক্রমাগত দেশত্যাগের জন্য প্ররোচিত করেছে। পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের নিরাপত্তাজনিত সমস্যা ছিল এ-কথা যেমন ঠিক, তেমনই পশ্চিমবঙ্গেও তাদের সুস্বাগতম জানানোর জন্য কেউ দাঁড়িয়ে ছিল না। তবুও সে মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা থেকে সহায়-সম্বলহীন মাস্টারের পরিবারকে সেই অন্ধকূপে টেনে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। শচীনরা সেই প্রজাতির মানুষ যারা নিজেরা অস্ত্র ধরে না, কিন্তু বিদ্বেষের বীজ ছড়িয়ে মানুষকে হিংস্র হতে প্ররোচিত করে। অন্ধকারের প্রাণীদের আলোর স্পর্শ সহ্য হয় না, তাই নাটকের শেষে সম্প্রীতির মুহূর্তে সে পালিয়ে যায়। স্পষ্ট হয়ে যায় শচীনের প্ররোচনায় পা দিয়ে মাস্টারের পরিবার দেশ ছাড়লে শিয়ালদহ স্টেশন বা উদ্বাস্ত ক্যাম্পের নোংরা আস্তানা থেকে উদ্ধার করতে সে এগিয়ে আসবে না।

কিন্তু দেশ মানে তো শুধু শচীন বা ইয়াসিন নয়। আমীন মুন্সি, কফিলদ্দি আর রতনদের নিয়ে তৈরি হয় দেশ। শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই দরিদ্র কৃষক কফিলদ্দি হিন্দুদের দেশত্যাগ সম্পর্কে বলতে পারে,

"চইল্যা গ্যালে বুজি তোমার অট্টালিকা উঠব—ধনদৌলত বাড়ব মিঞাা় বলি তোমার যদি আজ বাড়ি ছাইড়া চইলা যাইতে অইত—তোমার ক্যামন লাগত?"<sup>8২</sup>

অন্যদিকে হিন্দু কৃষক রতন বলে, "গরিবের মরণ দুই দিকেই। গরিবের কি আর মিত্র আছে?" এই বাক্য উচ্চারণ করতে কারোরই ধর্মবিশ্বাস টাল খায়না। সোনা মোল্লাও শেষ পর্যন্ত জীবনের দ্বান্দ্বিকতায় দেশের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝতে পারেন। গণনাট্যের নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তথাকথিত স্লোগানের ব্যবহার না করেও চমৎকারভাবে সম্প্রীতির মূল শিক্ষা দিয়ে যান। পাশাপাশি পূর্ব-পাকিস্তানের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থার দ্বন্দ্ব-সংকুল পটচিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেন।

সম্প্রীতির শিক্ষা নিয়ে গ্রামের হিন্দু-মুসলমানরা ইয়াসিন মোল্লার চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। দাঙ্গাবাজদের অস্ত্রের আঘাতে আমীন মুন্সি গুরুতর আহত হন। একই সময়ে শচীনের

ንራብ

প্ররোচনায় ভীত মহেন্দ্র মাস্টার দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। ঘটনাপরম্পরা তাঁর মধ্যে এক অবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। শুধু বাস্তুভিটা ছাড়ার যন্ত্রণা নয়, তাঁকে কষ্ট দিয়েছে দেশকে ভালোবাসতে না পারার যন্ত্রণা। তহশিলের খাতা, স্কুলের কাগজপত্রের মতো সামান্য জিনিসকে আঁকড়ে ধরে তিনি ভালোবাসা প্রকাশ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তিনি চিৎকার করে বলেন,

"নাঃ, যাব না... যাব না আমি কলকাতায়। দায় পড়েচে আমার কলকাতায় যেতে। ইস্কুলের সব খাতাপত্তর ম্যাপ... আমি কোথায় রেখে যাই? থাকবে, থাকবে কিছু... উই-এ কেটে সব শেষ করে দেবে না..."<sup>80</sup>

তাঁর স্ত্রী মানদা বাস্তুভিটা ত্যাগ করার ব্যাপারে সব থেকে বেশি উদগ্রীব ছিলেন। ভিনধর্মীদের থেকে নিরাপত্তার আশঙ্কা তার স্বাভাবিক মায়া-মমতাকে অবশ করে রেখেছিল। আজ শেষ মুহূর্তে ঘর-সংসারের সামান্য ছোটো ছোটো জিনিসগুলি নিয়ে তিনিও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তার কাছে দেশ বলতে এই বাড়িটুকুই ছিল। এক বিধর্মীর কাছে সেই বাস্তুভিটা সমর্পণ করে তিনি বলে ওঠেন,

"শুধু একটা অনুরোধ তোমায় করে যাব, আমার শ্বশুর-শাশুড়ি যেখানে রয়েচেন, সেই জায়গাটা... সেই জায়গাটা যেন কেউ অপবিত্র না করে..."<sup>88</sup>

সেই মুহূর্তে নাটক চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। বাইরে জনতার অস্পষ্ট কোলাহল শোনা যায়। তারপর বন্দুক হাতে সোনা মোল্লা ও কয়েকজন মুসলমান মহেন্দ্র মাস্টারের বাড়িতে জড়ো হয়। না, তারা মহেন্দ্রর পরিবারকে উৎখাত করতে আসেনি। বরং দাঙ্গাবাজ ইয়াসিনের চক্রান্তকে চূর্ণ করে তারা মহেন্দ্র মাস্টারকে এই দেশে আটকে রাখতে এসেছে। গায়ের জোরে নয়, বিশ্বাস, ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের শক্তিতে। অসুস্থ আমীন মুঙ্গিও চলে আসে মাস্টারের দেশত্যাগ রোধ করতে। দেরিতে হলেও সোনা মোল্লা ও অন্যান্য মুসলমানেরা বুঝতে পারে দেশ মানে আসলে মানুষ—জাতি-ধর্ম-বর্ণের উর্ধে উঠে শুধুই মানুষ। নাটকের শেষে মহেন্দ্র চিৎকার করে যেন সমগ্র দেশকে এই সত্য জানিয়ে দিতে চান, "...দেখে যাও সবাই অমানুষ নয়... মানুষ এখানেও আছে... এখানেও মানুষ আছে!"

## দাঙ্গাবিরোধী নাটক—'মশাল' :

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'মশাল' নাটকে বাগেরহাট দাঙ্গার পরবর্তী সময়ে কলকাতার দাঙ্গার চিত্র উঠে এসেছে। নাটকের 'নিবেদন' অংশে তিনি লেখেন,

"বিভক্ত বাংলায় ১৯৫০ সালে যখন পুনরায় সাম্প্রদায়িকতার বিষানল জ্বলে ওঠে তখন বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে রচনা করি মশাল।"<sup>8৫</sup>

'মশাল' নাটকের পটভূমি কলকাতার একটি কারখানা ও তৎসংলগ্ন শ্রমিক-বস্তি। যেখানে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি হিন্দু-শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করার যাবতীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। হীরালালের মতো শ্রমিকরা সরাসরি পাকিস্তান দখলের ডাক দেয়। সে মনে করে দাঙ্গা রোধ করার একটাই উপায়— ভারত সরকারকে চাপ দিয়ে পূর্ববঙ্গে সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে দুই বাংলাকে এক করা। এটা যেমন ঠিক যে হিন্দু-মুসলিম একে-অপরকে হত্যা করেছে, অন্যদিকে তারাই মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সেটুকুই হতে পারত আশার আলো। এই মানবিকতা অস্ত্র করে দাঙ্গাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হত। কিন্তু হীরালালদের পথ দেশকে আরও বড়ো ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাবে।

স্বাভাবিকভাবেই মতি, শঙ্কর, শোভনলালদের সঙ্গে তার সংঘাত শুরু হয়। বামপন্থী রাজনৈতিক জ্ঞানের পরশে তারা জানে বর্তমান দাঙ্গা একটা বিরাট ষড়যন্ত্র। এদেশে মুসলমান হত্যা করার অর্থ পূর্ববঙ্গে লিগের সাম্প্রদায়িক শক্তির হাত শক্ত করা। পাকিস্তানে আনসার বাহিনী যেভাবে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার করেছে, মহিলাদের সম্মান নিয়ে ছেলেখেলা করেছে, ঠিক সেরকমই পরিস্থিতি এই বাংলায় তৈরি হয়েছে। রামকান্তের মতো ভাড়াটে গুণ্ডারা আজ হঠাৎ 'হিন্দুদরদী' হয়ে নির্বিচারে মুসলিম নারী-শিশু হত্যা করে। এদের পিছনে আছে কারখানার ম্যানেজার, লেবার অফিসারের পুঁজিবাদী স্বার্থ। দাঙ্গা পরিস্থিতি জিইয়ে রেখে তারা শ্রমিক-ঐক্যে ভাঙন ধরিয়ে ছাঁটাই অব্যাহত রাখতে চায়।

এদের বিপরীতে সম্প্রীতির আদর্শ উদাহরণ মতির বোন ললিতা। যে পূর্ববঙ্গের দাঙ্গায় সন্তান হারিয়েছে এবং শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছে। তার মানসিক অবস্থা বোঝার মতো শক্তি মতির নেই। সে শুধু দেখতে পায়,

"একটি কথাও মুখে বলে না, কিন্তু ওর চোখে-মুখে এক বিরাট প্রশ্ন—সে প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজে পাইনে।... ললিতা কাঁদলেও বাঁচতাম... না কাঁদে, না হাসে..."<sup>86</sup>

ললিতার এরকম মানসিক অবস্থায় মতি তার কোলে জালালের শিশু সন্তান জয়নালের দায়িত্বভার তুলে দেয়। মতি ভেবে দেখেনি ভিনধর্মের হাতে সন্তান হারানো ললিতার কোলে 'শত্রুর সন্তান' তুলে দিলে তার অবস্থা কী দাঁড়াতে পারে! ললিতার দুঃস্বপ্নে তার মৃত সন্তানের কান্নার রেশ শোনা যায়। বাইরের উত্তাল পরিস্থিতির প্রভাবে এক-এক সময়ে তার মনে হয়,

"আমার বুক যারা মরুভূমি করে দিয়েচে, তাদেরই একজনকে আমি আমার বুকের স্নেহ দিয়ে তিলে তিলে বাড়িয়ে তুলচি। আমি কাঁদি, ও হেসে আমায় জড়িয়ে ধরে—জোর করে আমার চোখের জল মুছে ফেলতে হয়। [অকস্মাৎ উত্তেজিত হয়ে] কেন, কেন, কেন আমার এ শান্তি?... না, না, পারবো না, পারবো না—ওকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও—নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিনে দাদা... হয়তো... ওকে একদিন আমি... হাঁ, হাঁ, হয়তো একদিন ওকে আমি... এমনি করে... [গলা টিপে মারবার ভঙ্গী করে]"<sup>89</sup>

ললিতা জয়নালকে মারতে পারেনি, তার পক্ষে শিশুহত্যা সম্ভব না। সে জানে সন্তান হারানোর যন্ত্রণা। জয়নালের মধ্যে সে খুঁজে পেয়েছে তার মৃত সন্তানকে। মাতৃত্ব ধর্ম দেখে না, জাত দেখে না। মতির মতো কোনো বাহ্যিক রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রভাবে সে নিজেকে বদলায়নি। বরং তার স্বতোৎসারিত নারীচেতনা ও মাতৃত্বের শক্তিতে সে সমাজের সমস্ত কুশক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে।

কিন্তু এদেশের 'আনসার' হীরালাল, রামকান্তদের হাত থেকে সে জয়নালকে বাঁচাতে পারেনি। দাঙ্গার বিরুদ্ধে শোভাযাত্রায় বিহারি শ্রমিক শোভনলালকে খুন হতে হয়। একাধিক মৃত্যুযন্ত্রণা মতির বৈপ্লবিক শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমবেত শ্রমিক আন্দোলন ও স্বতঃস্ফূর্ত

জনতার সুচেতনায় দাঙ্গার অস্থিরতাকে রোধ করা সম্ভব হয়। এই সম্প্রীতির বার্তা প্রচার করার উদ্দেশ্যেই 'মশাল' নাটকের সৃষ্টি। অবশ্য উদ্দেশ্যপ্রবণতার জন্য সাম্প্রদায়িকতার উৎস ও শ্রমিকদের শান্তিবার্তা প্রচারে বামপন্থী তাত্ত্বিক চেতনাই অগ্রাধিকার পেয়েছে। কিন্তু তৎকালীন সময়ে 'মশাল' নাটক দাঙ্গাবিরোধী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের বয়ানে,

"সাহিত্যে নৈরাশ্যবাদ প্রচার না করে মানুষের মনে যদি আশার আলো জ্বেলে তুলতে হয় তবে জনতার এই সংগ্রামশীল সেনামুখটি উজ্জ্বল করে এঁকে সর্বসাধারণের কাছে উপস্থিত করার বিশেষ দায়িত্ব আজকের দিনে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের আছে বলে আমি মনে করি এবং সেই দায়িত্ববোধ থেকেই আমার 'মশাল'-এর সৃষ্টি।"<sup>8৮</sup>

# উদ্বাস্তজীবনের নাটক—'দলিল' :

দেশভাগের যন্ত্রণা বাংলার যে সকল শিল্পী-সাহিত্যিকদের সব থেকে বেশি নাড়া দিয়েছিল ঋত্বিক ঘটক তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর সিনেমা-নাটক-ছোটোগল্পের বিস্তৃত অধ্যায় জুড়ে তিনি ফেলে আসা 'বাংলাদেশের মা'-এর সন্ধান করে গেছেন। দেশভাগের যন্ত্রণা তিনি আজীবন ভুলতে পারেননি, চাননি বাঙালি সেই স্মৃতি ভুলে যাক। তাঁর সহধর্মিণী সুরমা ঘটক লিখছেন,

"একটা গভীর জীবনের ব্যথা আছে, আর লুকিয়ে আছে বুকফাটা বেদনা আর ক্ষোভ। একটা অস্থির যন্ত্রণা, যে যন্ত্রণাকে সাথে নিয়ে আমরা প্রতিদিন পথ চলি। কতকগুলো ঘরছাড়া সম্পূর্ণ মানুষ যে নাটকীয় ঘোরাফেরা করছে তারই নাম 'দলিল'।"<sup>8৯</sup>

'দলিল' নাটকে প্রচলিত দৃশ্য-অঙ্ক ভেদ নই, বরং তিনটি প্রবাহে বিন্যস্ত। যেরকম প্রবাহের পর প্রবাহে মানুষ দেশত্যাগী হয়েছিল। নাটকের প্রথম প্রবাহ শুরু হয় স্বাধীনতার পূর্বক্ষণে। প্রেক্ষাপট পূর্ববঙ্গের রূপাইকান্দি গ্রাম। দাঙ্গা পরবর্তী ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতার উত্তেজনা গ্রামবাসীদের চাপা বিভাজনকে পুনরায় স্পষ্ট করে তুলছে। দেশভাগের জন্য সকলেই প্রস্তত—শুধু অপেক্ষা কোন

অঞ্চল কোন দেশে পড়ে তার ঘোষণার। হরেন পণ্ডিত মনে করে পাকিস্তান হয়ে গেলেই মুসলিমরা তাদের সহ্য করবে না। একই দেশের নাগরিক হয়েও শুধুমাত্র ধর্মের জন্য মহিন্দররা হয়ে যাবে 'কাফের'। সাধারণ মুসলিম কৃষক কলিম এতদিন ভেবেছিল,

"কাফের! (হেসে) আজাড়া বাত বুলবেন না। মহিন্দররা থাকবে, খালি অত্যাচারী হেঁদুর

নিরসন হবে, মুসলিম চাষি জমি পাবে।"<sup>৫০</sup>

এর বাইরে কলিমরা কীভাবেই বা অন্যকিছু ভাববে? মহিন্দর-কলিম দুজনেই ফিরোজার কোলে মানুষ। সুখে-দুঃখে, রাগে-অভিমানে তারা একসঙ্গে বড়ো হয়েছে। দুজনে মিলে কত গম্ভীরা গান বেঁধেছে। জমিদারদের অত্যাচার ক্ষেতু-গোপাল-কলিম একসঙ্গে ভোগ করেছে। আজ কলিম-ফিরোজারাও হয়ে পড়েছে সংখ্যালঘু মুসলিম। দেশ চালাবে 'ফরেন' মুসলিম। সেই দেশভাগের চক্রান্তকারী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং কট্টর ধর্মীয় ধ্বজাধারীদের কাছে দেশ মানে ছিল ক্ষমতার কায়েমি স্বার্থ। তারা কিছুতেই নীচুতলার হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার স্মৃতি ভুলে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে দেবে না। 'পাকিস্তান'-কে সামনে রেখে দেশভাগ হয়ে ওঠে এক বিরাট বিশ্বাসঘাতকতার সাক্ষী।

বহু প্রতীক্ষিত একটি রেডিও ঘোষণা আচমকা ক্ষেতু ঘোষের মতো লক্ষ লক্ষ জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। স্বাধীনতা পাওয়া গেছে—কিন্তু ক্ষেতু ঘোষ, হরেন পণ্ডিত, দেবেন্দিরদের সেই স্বাধীনতায় অধিকার নেই। রূপাইকান্দি পড়েছে 'পাকিস্তান'-এর মধ্যে। সেই মাহেন্দ্রক্ষণের মুহূর্তে ক্ষেতু ঘোষের কোনো ভিটে নেই, কোনো পরিচয় নেই। একটাই লক্ষ্য—দেশত্যাগ। "হুই আঁধারের মাঝে লুকায়্যা আছে উপার, হিন্দুস্থান!"

কেমন সেই আঁধারে মোড়া হিন্দুস্থান, কেমন তার মানুষ, কেমন সেই দেশ? এদের কারোর কোনো ধারণা নেই। কিন্তু এপারের অবস্থাও ক্রমশ সঙ্গিন হয়ে উঠছে। যে এছহাক মিঞা কদিন আগে পর্যন্ত মহিন্দর লেঠেলকে সমীহ করে চলত আজ সে-ও পরোক্ষে শাসিয়ে দিয়ে গেছে। গ্রামের হিন্দু মুরুব্বিরাও দেশত্যাগের তোড়াজোড় শুরু করেছে। আসলে একটা নিরাপত্তাহীনতা পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুদের গ্রাস করছিল। ফিরোজা বা কলিমের পক্ষে এই বড়ো আঘাতের ওষুধ খুঁজে

পাওয়া সম্ভব ছিল না। ফিরোজা নানি শুধু বলেছিল, "আমার মনটা বুলছে, বুঝলা ক্ষেতু, কোতি না কোতি কোনো লোক লাভ করত্যাছে। কোনো লোকে লাভ করার মতলবেই দেশভাগ আর দেশান্তরী করার ঢেউটা লাগাছে।"<sup>৫১</sup> অসংখ্য রাজনৈতিক মিটিং-মিছিল, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করেও যে কথাটা বলা হয়ে ওঠেনি, ফিরোজা নানি অত্যন্ত সহজ স্বরে সেই সত্য কথাটা বলে দেয়।

কিন্তু ততদিনে মহিন্দর মনস্থির করে ফেলেছে। সংবাদপত্রগুলির ফাঁদে পড়ে তার মনে হয়েছিল, "উপার কত বন্দোবস্ত কর্যাছে হিন্দুস্থান সরকার, এটা সুবিধা হয়্যা যাবেই" কিংবা "সরকারের বন্দোবস্ত আছে, হিন্দু ভাইরা আছে।" অনিচ্ছুক ক্ষেতু-পদ্মকেও সে জোর করে রাজি করায়। পদ্ম বুঝেছিল একবার গেলে আর ফেরা নেই। তবু তারা বেরিয়ে পড়ে নতুন 'দ্যাশ'-এর উদ্দেশ্যে। 'বদর, বদর' ধ্বনিতে নৌকা এগিয়ে যায়। পিছনে পরে থাকে সাতপুরুষের ভিটেমাটি, স্বপ্ন, স্মৃতি, অতীত, ভিনধর্মী প্রতিবেশী।

নাটকের দ্বিতীয় প্রবাহ শুরু হয় শিয়ালদহ স্টেশনে। পূর্বে শিয়ালদহের যে হাজার হাজার অজানা উদ্বাস্ত জীবনের বিবরণ দিয়েছি, তার মধ্যে কয়েকটি মাত্র পরিচিত মুখ—ক্ষেতু ঘোষ ও তার পরিবার। খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, বাসস্থান নেই, চিকিৎসা নেই। আছে শুধু পদ্ম-স্বর্ণর দিকে তাকিয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ লোলুপ চোখ। আছে শহরের ধোঁয়া ধোঁয়া আকাশ। আছে অফুরন্ত নস্টালজিয়া।

"ক্ষেত্ন : ই দ্যাশটা হামার মনঃপুত হয় নাই।

পদ্ম : [হেসে] ভিট্যার বাগানখানের কথা ভাব বুঝি!

ক্ষেতু : না। শ্বাসটা নিবার গেলে এখানকার হাওয়াও য্যান আপত্তি করে।... আচ্ছা, পদ্মার কিনারে সেই ভীমসেনের জাঙ্গালের কথাখান মনে আছে তোর? সেই যে ঢাল জমির পাশে খাড়াই পার, হামার কুশারের খেতের বগলটাত্?

পদ্ম : ক্যানে?

ক্ষেত্ন : উত্থানকার হাওয়াটা হামার পছন্দ আছিল।"<sup>৫২</sup>

এই সব দেখে ক্ষেতুর "শখ মিট্টা গেছে ... হিন্দুস্থান আর হিন্দু ভাই।" এখানে এসে উপস্থিত হয় এক অদ্ভুত চরিত্র, নাম অর্জুন মালাকার, ঠিকানা পাবনা। তার হাতে ফেলে আসা ভিটেমাটির দলিল। দেশ ছাড়ার আগে তাকে বোঝানো হয়েছিল এদেশে এসে হিন্দু সরকারের রাজাকে দলিল দেখালে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তাই সে সবার কাছে এদেশের রাজার ঠিকানা খুঁজে বেড়ায়। দলিলটা ছিল তার একমাত্র অভিজ্ঞান।

অর্জুন মালাকারের উদ্ভ্রান্তির কারণ কী? ভিটেমাটি হারানো উদ্বাস্ত জীবনের পরিচয়হীনতা কি তাকে 'পাগল' করে তুলেছে? হয়তো একটুকরো জমির আশ্বাস, নিজের ধানক্ষেত, একটা লাঙল তাকে ফের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারত। তার অসার মস্তিষ্ক ধীরগতিতে হলেও বুঝতে পারে দেশভাগের নামে তাকে বোকা বানানো হয়েছে। এদেশে তার 'দলিল'-এর কোনো গুরুত্ব নেই। রাজা নয়, এবার সে সন্ধান শুরু করে সেই শত্রুর। সে চিৎকার করে বলে,

"শত্তুরটা কেটা? কে শত্তুর? দুশমন কনে?—তারে ধরতে আমি পারবই, তারে চিনতে আমি পারবই। সেদিন? গর্জন কর্যা টুঁটি কামড্যায়া ছিঁড়া লব সেদিন। নলিডা—"<sup>৫৩</sup>

অর্জুন মালাকার জানত না তার 'রাজা' ও 'শত্তুর' আসলে একই লোক। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ১৯৪৯ সালে কলকাতায় এলে উদ্বাস্তরা তার কাছে আবেদনপত্র জমা দিতে যায়। সেই সময়ে পুলিশের গুলিতে অনেকের মৃত্যু ঘটে। অর্জুন মালাকার তাদের মধ্যে একজন। তার পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'দলিল'-টা কোথায় হারিয়ে গেল কেউ জানে না!

তৃতীয় প্রবাহে ক্ষেতু ঘোষের পরিবার যাদবপুরের একটি উদ্বাস্ত কলোনিতে উঠে আসে। কলোনি বলতে একটি জীর্ণ, ভগ্ন পুরনো ব্যারাক। ততদিনে অবশ্য সময় অনেকটা চলে গিয়েছে। উদ্বাস্তরা নতুন বাসস্থানে, নতুন পরিচয়ে আবার জীবনকে গুছিয়ে নিতে শুরু করেছে। হরেন পণ্ডিত উদ্বাস্তু শিশুদের নিয়ে একটি পাঠশালা খুলেছে। কিন্তু চাইলেও তো আর পুরনো জীবনে ফেরা যায় না। এই কয়েক বছরে কলকাতা শহর ও উদ্বাস্তু জীবন তাদের চিন্তা-চেতনা-মূল্যবোধ আমূল বদলে দিয়েছে। দুরন্ত পদ্মার বুকে খেলা করা পদ্মর চোখে-মুখে অবসাদের বলিরেখা। এককালে মহিন্দরের

শিশু সন্তান হারুর পায়ে দড়ি বেঁধে পদ্ম সারা পাড়া ঘুরিয়ে নিয়ে আসত। পিসির হাতে বানানো একটা ভেঁপু পেলেই সে সন্তুষ্ট ছিল। আজ হারু সিনেমা দেখতে চায়। এখন হারুর চোখে একটাই স্বপ্ন। পাঁচুদার চায়ের দোকানে বয়ের কাজ করে সে টাকা কামাবে। শৈশবের কি মর্মান্তিক অপচয়!

প্রতিবেশী দেবেন্দির উড়িষ্যায় জমি নিয়ে চলে যেতে চায়। সরকার থেকে উড়িষ্যার প্রত্যন্ত প্রান্তরে উদ্বাস্তদের পুনর্বাসন দেওয়ার ঘটনা আমরা আলোচনা করেছি। দেবেন্দির সরকারি ঢক্কানিনাদের সেই ফাঁদে পা দিয়ে ভেবেছিল 'উড়িষ্যায় ধান্যাজমি বোধ করি খুব সরেস হয়'। তাকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে লাঙলে হাত দিতে না পারা যন্ত্রণা। মহিন্দরকে কারখানার মালিকরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল ধর্মঘট ভাঙার জন্য। অনুরূপ ঘটনা আমরা দেখেছিলাম 'উত্তর সারথী' প্রযোজিত সলিল সেনের 'নতুন ইহুদি' নাটকে। কিন্তু মহিন্দর কারখানায় কাজ করতে পারেনি। চব্বিশ দিন ধর্মঘটরত শ্রমিকদের ক্ষুধার্ত অথচ সংগ্রামদৃপ্ত মুখগুলোকে দেখে তার মনে হয়েছিল, ''মরদের লড়াইয়ে ফেউ— অত নিচু হামি হল্যাম না।"

দারিদ্রের চূড়ান্ত হাহাকারের মধ্যে সরকার 'উচ্ছেদ আইন' জারি করে। অর্থাৎ মাথা-গোঁজার ঠাঁইটুকু বিসর্জন দিয়ে আবার উদ্বাস্তু হতে হবে। সকলে একত্রিত হয়ে প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয়। সকলেই মেনে নিয়েছে 'বাস্তুহারা' ও 'সংগ্রাম' আসলে সমার্থক শব্দ। তারা অতীত ভুলে নতুন জীবন শুরু করতে চায়। কিন্তু ক্ষেতু আজও নিজের 'উদ্বাস্তু' পরিচয় মেনে নিতে পারেনি। তার মনে হয় 'রিফিউজি', 'শরণার্থী' শব্দগুলির মধ্যে একটা 'চোরা-চোরা' ব্যাপার আছে। যেন কেউ বা কারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের পূর্বপরিচয় ভুলিয়ে দিতে চায়। তাই গোপাল যখন চিঠি দিয়ে কলিমের মাধ্যমে রূপাইকান্দির ভিটেমাটি বিক্রির বন্দোবস্ত করে তখন ক্ষেতুর সঙ্গে সকলের দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

"গোপাল : আচ্ছা, হুই পাছের জীবনের জগদ্দলটা ঘাড়ে বয়্যা কোনো লাভ আছে? উখানে থাকল জমিঘর। ইখানে হামরা না খায়্যা মরি। ইয়ার কোনো ইয়াদিশা আছে? বরং ভিট্যা বেচ্যা এখানে এট্টা কিছু করা যাবে নে। কলিমের থিকা এট্টা সুখবর পালে হামি কিংবা দাদা দলিল-দস্তাবেজ লয়্যা যায়্যা সব বন্দোবস্ত কর্যা আসবনে—

ক্ষেতু : এটা ঠিকানা আছে, বুঝলু? আজও তোর এটা ঠিকানা আছে। কিন্তুক সিটা হারালে

তুই হয়্যা যাবু কাটা বাংলার ভূঁইফোঁড়। দুনিয়ায় তোর ঠিকানা নাই হয়্যা যাবে।"<sup>৫8</sup>

এই ঠিকানার সন্ধানে অর্জুন মালাকারকে গুলি খেতে হয়েছিল। ফেলে আসা ঠিকানা শুধুমাত্র স্মৃতি বিজড়িত ভিটেমাটি নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মপরিচয়ের শিকড়। যে ক্ষেতু ঘোষ বলেছিল "ভিক্ষা হামি পারব না" বা "ভিখ মাগ্যা মিলবে না হে। দেশ কাটয়া দু-ভাগ কর্য়াছে যারা, তাদিগের কাছে ভিখ লয়", আজ রাতের অন্ধকারে সে শহরের অলিগলিতে ভিক্ষা চেয়ে বেরোয়। কীসের লজ্জা, কীসের মান-সম্মান! ভুঁইফোঁড়ের তো মান-সম্মান বোধ থাকতে নেই। তার নিজের জবানিতে "ঘর, ঘর যার নাই, তার আবার মান!"

তৃতীয় প্রবাহের দ্বিতীয় অংশ শুরু হয় মৃত্যুর বিভীষিকা দিয়ে। কলোনির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কলেরা-ভেদবমিতে বিনা চিকিৎসায় হারুর মৃত্যু ঘটে। কোনো ঘরে রেশন নেই, ক্যাশডোলের ব্যবস্থা নেই, পরনের কাপড় নেই। "মরা মনিষ্যি, বাবু, হামরা সব মরা মনিষ্যি!" আসলে রাষ্ট্র এদের জীবনীশক্তিকে শূন্য করে দিতে চায়। ন্যূনতম বেঁচে থাকার লড়াইয়ে আজীবন ব্যতিব্যস্ত করে একটা ঘৃণ্য জাতিসত্তার জন্ম দিতে চায়। যাদের ঘর নেই, ভাষা নেই, সংস্কৃতি নেই, আত্মপরিচয় নেই। একটা সময়ে তাদের লড়াইয়ের উদ্দেশ্যও হারিয়ে যেতে বাধ্য হবে। সেই সময়ে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আসা একটি চিঠি পুনরায় তাদের লড়াইয়ের শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। কলিম শেখ লিথেছে পূর্ব-পাকিস্তানে বেঁধে ওঠা লড়াইয়ের কথা। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের অর্থনৈতিক লড়াই নয়; এ লড়াই ভাষার লড়াই, জুবানের লড়াই, ভিনদেশি রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে অধিকারের লড়াই। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের বুকে যে আগুন জ্বালিয়েছিল সেই আগুনে শুদ্ধ হয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ঋত্বিক ঘটক মাত্র একটি বাক্যে এই বাংলায় তারই বুনিয়াদ শুরু করে যান, "বাংলারে কাটিছ কিন্তু দিলেরে কাটিবারে পার নাই।"

'দলিল' নাটকে বেশ কিছু দুর্বলতা আছে। স্থান-কালের ঐক্য যথাযথভাবে রক্ষিত হয়নি। নাটকের প্রথম প্রবাহের ঘটনাকাল ১৯৪৭ সালে শুরু হলেও দ্বিতীয় প্রবাহ চলে আসে ১৯৪৯ সালে।

তৃতীয় প্রবাহের প্রেক্ষাপট ১৯৫১-১৯৫২ সাল। তৃতীয় প্রবাহের দ্বিতীয় অংশ হারুর মৃত্যুর বিষাদের সুর দিয়ে শুরু হয়। কিন্তু শেষে ভাষা আন্দোলনের অনুষঙ্গে প্রত্যেকের মধ্যে পূর্ব প্রস্তুতিহীন প্রতিরোধের চেতনা জেগে ওঠে। ঋত্বিক ঘটক নিজেও এই নাটকের দুর্বলতা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি জানিয়ে গেছেন। তবুও তাঁর পূর্ববঙ্গীয় ভাষার সাবলীল লেখনীতে 'দলিল' নাটকের গতি আমাদের মুগ্ধ করে রাখে। আসলে 'দলিল' নাটকের একমাত্র উদ্দেশ্য 'ভাঙা বাংলার প্রতিরোধ'। তাঁর মতে কালই নাটকের প্রধান পাত্র এবং প্রধান নায়ক। নাটকের 'প্রসঙ্গত' অংশে তিনি বলেছেন,

"এ-নাটক আমি 'শেষ' করতে পারিনি। এর বুঝি শেষ নেই। আজও সে পরিণতি আসেনি। একদিন আসবে। এ-নাটকের নায়ক জনতা একদিন তা আনবে। সেই ভবিষ্যৎ পরিসমাপ্তির ইঙ্গিত আজকের প্রতিটি মিছিলে। তার আসার পথের প্রতি মোড়ের চিহ্ন নিয়েই 'দলিল', যে-দলিল আজও লেখা হচ্ছে। এর শেষ পাতাটি লিখবে মহালেখক জনতা, তার জন্যই সে-জায়গা আমি ছেড়ে গেলাম।"<sup>৫৫</sup>

# ওপারের জীবন ও মৈত্রীর সন্ধান—'বাংলার মাটি' :

ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল' ও তুলসী লাহিড়ীর 'বাংলার মাটি' নাটকদুটি যেন সমান্তরাল কালে চলতে থাকে। দুটি নাটকের ঘটনাই সমাপ্ত হয় ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত তীব্রতার মধ্যে। তবে 'দলিল' নাটকের প্রেক্ষাপট এপার বাংলা এবং 'বাংলার মাটি' নাটকের প্রেক্ষাপট ওপার বাংলা। 'দলিল' নাটকে উঠে এসেছে 'উদ্বাস্তু' জীবনের চিত্র এবং 'বাংলার মাটি'-তে উঠে আসে পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু হিন্দুর জীবনযন্ত্রণার চিত্র।

পূর্ব-পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের একটি শহরে বৃদ্ধ কালীকিঙ্কর, তার পুত্রবধূ কিরণশশী, নাতনি চিত্রা ও নাতি লটকার ছোটো সংসার। পাকিস্তান হওয়ার পর তারা দেশত্যাগ না করলেও এক অসহায় আত্মসংকট তাদের সারাক্ষণ ঘিরে রাখে। গোটা পাড়ায় তারাই একমাত্র হিন্দু পরিবার।

যদিও পরিবারটির উপর সরাসরি কোনো আক্রমণ নেমে আসেনি। কিন্তু পাকিস্তানে হিন্দুদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা তাদের ক্রমশ হতাশ করে তোলে।

প্রতিবেশী সম্ভ্রান্ত মুসলমান আবু মিঞা বন্ধুভাবেই অনুযোগ জানিয়েছিল হিন্দুদের অতিরিক্ত সংস্কারপ্রবণতা আজকের সংকট ডেকে এনেছে। একইসঙ্গে তিনি জানেন ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণির ক্ষমতার মদমত্ততা নিজেদের স্বার্থবুদ্ধির জন্য দুই জাতির মিলন কখনও চায়নি। তিনি বলেন,

"শক্তির মদে যারা উদ্ধত, তারা তাদের স্বার্থের রথ জোর করেই চালায়। তারা বলে হয় পথ দাও নয় পিষে যাও। তবে খুব বড় একটা বৈজ্ঞানিক সত্যকে উপেক্ষা করে তারা ভুল করে। For every action there is equal and opposite reaction. ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না তারও সূর্য অস্ত যাচ্ছে।"<sup>৫৬</sup>

আবু মিঞার পক্ষে পুরনো ইতিহাসের দুর্বলতা খুঁজে আজকের সময়কে ব্যাখ্যা করার কাজটা অতি সহজ। তিনি একটি কয়লাখনির মালিক, তার ছেলে ছলিম মুসলিম লিগের বড় নেতা, নাতি নুরু ঢাকার কলেজের SF (Student Federation) নেতা। অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তানে আর্থিক ও সামাজিকভাবে তারা নিরাপদ। কিন্তু কালীকিঙ্করবাবুর পরিবারকে পিষে মরতে হচ্ছে বহু দিক থেকে। যখন গুণ্ডাদের জ্বালায় চিত্রার কলেজ যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন কেউ প্রতিবাদ করেনি। লটকার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল স্কুলে মুসলিম ছাত্রদের পরোক্ষ অত্যাচারে। মনুষ্যত্বের এত বড়ো অপমান মানুষ কত দিন সহ্য করতে পারে?

তাই চিত্রার মনে হয়েছে এদেশে প্রতিনিয়ত মরার চেয়ে ভারতে এসে উদ্বাস্ত সংগ্রামের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া ভালো। তার ভাষায়,

"আমি বলছি রাজশক্তির কথা, রাষ্ট্রের কথা। তারা যে প্রতিনিয়ত, প্রতি ব্যবহারে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে এদেশে আমরা অবাঞ্ছিত। আমাদের উপর কোনো অন্যায় হলে তার প্রতিকার নেই। কোনো জুলুম হলে রক্ষা করার কেউ নেই।"<sup>৫৭</sup>

ইসলামিক সমাজব্যবস্থার নিপীড়ন যেমন আছে, তেমনই সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজের ক্ষুদ্র স্বার্থের নাগপাশও তাদের জীবন অসহায় করে তুলছে। যার উদাহরণ উকিল সদানন্দবাবু। সদানন্দবাবু সদ্যমৃত স্ত্রীর বিয়োগ বেদনা ভুলে চিত্রাকে বিয়ে করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তাহলে পাকিস্তানি রাষ্ট্রের নিয়মনীতি অনুসারে তার আর্থিক স্বার্থ নিরাপদ হবে। চিত্রা খবর পেয়েছে ভারতে পালিয়ে এসে তার বন্ধু গীতা, শান্তারা সচ্ছল জীবিকা খুঁজে পেয়েছে। আমরা জানি চিত্রার জ্ঞান আর উদ্বাস্তদের বাস্তব সত্যের মধ্যে একটা বিরাট শূন্যতা রয়েছে। আমাদের সেই প্রত্যয়কে নিশ্চিত করতে এসে উপস্থিত হয় অনিতা ওরফে আনোয়ারা খাতুন। পিতা-মাতাহীন অনিতা একদিন মামা-মামির হাত ধরে শিয়ালদহ স্টেশনে এসে উপস্থিত হয়েছিল। তাকে উদ্বাস্ত জীবনের প্রতিটি ঘাটের জল খেতে হয়েছে। এমনকি মামি তাকে বেচে দেওয়ার চেষ্টাও করেছিল। আনোয়ারা ধর্মের সংকীর্ণতা বিসর্জন দিয়ে ফিরে এসেছিল পুরনো প্রণয়প্রার্থী আলি সাহেবের কাছে। তার মনে হয়েছিল "হিন্দুর চেয়ে মুসলমান অনেক বিষয়ে উদার"। সে আজ সুথে আছে, আলি সাহেবের বদান্যতায় তার মামির পরিবার ভারতে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছে। সে চিত্রাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল এ-বঙ্গের উদ্বাস্ত জীবনের যন্ত্রণার কথা। উত্তরে চিত্রার কিছু বলার ছিল না। সে শুধু বলেছিল "জাতি হিসেবে সমন্ত বাঙালি জাতি আজ পরাজিত।"

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হওয়ার আগে একটি দুর্ঘটনা ঘটে যায়। অনিতার সাবধানবাণী সত্ত্বেও চিত্রা তার বন্ধু আবু মিঞার নাতি নুরুর সঙ্গে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। স্টেশনে আনসার বাহিনী চিত্রাকে আটক করে 'জাতীয় সম্পদ' পাচারের অপরাধে। যে বিপদ এতদিন ঘরের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল, চিত্রার একটা ভুলে তা ঘরের মধ্যে সিঁধিয়ে বসে। আনসার বাহিনী ও পুলিশের সন্দেহ, মুসলিম সমাজের শাসানি এবং হিন্দু সমাজের হাস্যাস্পদ নজরদারির মধ্যে সমগ্র পরিবারটি বিপন্ন বোধ করে। কালীকিঙ্কর অসুস্থ হয়ে পড়েন। লটকার মুসলিম সমাজে মেলামেশা বন্ধ হয়ে যায়। আবু মিঞার পরিবারও তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এই অবস্থা থেকেও সুবিধা নিতে চেয়েছিল সদানন্দ উকিল। দুই প্রাপ্তবয়স্ক বন্ধুর কলকাতা যাত্রাকে সে মুসলিম কর্তৃক হিন্দুনারীর অপহরণের ঘটনারপে রটিয়ে দিয়েছিল। তাতে হিন্দুসমাজের সহানুভূতি আদায় করে তার ব্যবসার

উন্নতি সম্ভব হবে এবং পরিবারটিকে একঘরে করে চিত্রার সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাবটিকে পাকা করা যাবে। কিন্তু সে জানত না এই ঘৃণ্য প্রস্তাবটি থেকে বাঁচার জন্যই চিত্রা ঘর ছেড়েছিল। চিত্রা প্রতিবাদী কণ্ঠে বলে ওঠে,

"সহজ এবং সরল মানুষ আপনারা সৃষ্টি কত্তে পারেন না। পারেন আত্মসুখী সুবিধাবাদী ভণ্ড সৃষ্টি কত্তে। তাই আজ এক আঘাতে সমস্ত বাংলার হিন্দু সমাজের কাঠামো ভেঙে পড়ছে। বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, দর্শন—সাহিত্য, গীতা কিছুতেই তাকে রুখতে পাচ্ছে না।"<sup>৫৮</sup>

আবু মিঞাও বিশ্বাস করেন সংস্কারহীন সম্প্রীতিতে। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি চিত্রাকে ধর্মপরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখে নুরুর সঙ্গে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু চিত্রা তো এই ব্যবস্থা চায়নি। সে নিজের শক্তিতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছিল, আবু মিঞার ট্রাস্টি-র অর্থে নয়। সেটাও তার কাছে অপমানজনক। ফলত সমস্ত সমস্যা পরিবারটিকে একটি সমাধানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়— দেশত্যাগ। সেই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে চাপিয়ে দেওয়া উর্দু ভাষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে প্রাণ দেন রফিক, বরকত, জব্বাররা। সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের প্রতিবাদে সারা পূর্ব-পাকিস্তান প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে।

কালীকিঙ্করবাবুর দেশত্যাগ করা হয়ে ওঠে না। বাড়ির আপত্তি সত্ত্বেও লটকা জড়িয়ে পড়ে ভাষা আন্দোলনে। প্রথমে সে আহত হয় এবং পরে তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সে প্রশ্ন করেছিল, "বাংলা কি শুধু ওদেরই ভাষা?" লটকার মনে হয়েছিল দেশের ধর্মগত অধিকার মুসলমানদের হতে পারে, ভাষার গৌরব তো কোনো ধর্মের একচেটিয়া নয়। তার বাঙ্ডালিয়ানার অহং-কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ভাষা আন্দোলনে। সাদাসিধে লটকা উত্তেজনার বশে এত কথা গুছিয়ে বলতে পারেনি। সে বলেছিল,

"বাংলা ভাষায় যত রাজ্যের উর্দু, ফারসি ঢুকিয়ে জবরজঙ্গ ওরাই কচ্ছে, আবার বাংলা ভাষার জন্য লড়াই করে ওরাই নামও কিনবে? বাংলা ভাষা আমাদের যত আদরের ওদের কি তাই? সমস্ত বাহাদরি ওরাই নেবে!"<sup>৫৯</sup>

লটকার কথায় যেন সকলের সম্বিত ফেরে। চিত্রা বুঝতে পারে সংগ্রামের কোনো জাত নেই, ধর্ম নেই। পাকিস্তানের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় হিন্দু-মুসলমান উভয়েই নিপীড়িত; কেউ ধর্মের জন্য, কেউ জাতিসত্তার জন্য। যেখানে অত্যাচার আছে, সেখানে একদিন না একদিন প্রতিবাদ জেগে উঠবেই। চিত্রা দেশত্যাগ করতে চেয়েছিল আত্মার অপমানে। আজ ভাষার রূপ ধরে দেশের আত্মা তাকে লড়াইয়ের ডাক পাঠিয়েছে। আজ সে এই লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে কিছুতেই পালিয়ে যাবে না।

নাটককার তুলসী লাহিড়ী 'বাংলার মাটি' নাটকের মধ্য দিয়ে ওপার বাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুজীবনের বাস্তবচিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেন। এপার বাংলার বাস্তহারা সংগ্রামের বিবরণ আমরা জানি, কিন্তু ওপারের সংগ্রামের কথা পশ্চিমবঙ্গের বাংলা নাটকে দুর্লভ। তিনি দেখিয়ে দেন শত আঘাত সহ্য করেও পাল্টা লড়াই ফিরিয়ে দেওয়ার নাম জীবন। যা ভাঙা বাংলার দু-কূলেই সত্য। তিনি 'নাট্যকারের নিবেদন' অংশে জানিয়েছিলেন যে সমাধান দেওয়ার দায়িত্ব নাটককারের নয়। তবু তিনি অপার মমতায় ভাষাকে আঁকড়ে ধরে ধর্মীয় বিভেদমুক্ত এক সুন্দর সমাজের সন্ধান করেন।

## মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তর অবক্ষয়—'উজান যাত্রা' :

অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি উদ্বাস্তুদের সামাজিক জীবনকেও পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়েছিল। বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'উজান যাত্রা' নাটকে উদ্বাস্তুদের সামাজিক জীবন ও সংগ্রামের কথা উঠে আসে। নাটকের ঘটনাক্রম স্বাধীনতার এক দশক পরে বিস্তৃত। স্বাধীনতার পর পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু অবস্থায় আগত জগৎ সেন ও অপর্ণা সেনের পারিবারিক জীবনে দারিদ্র্য কখনও পিছু ছাড়েনি। আজ তারা এ-দেশের মাটিতে থিতু হলেও 'উদ্বাস্তু' শব্দটির সঙ্গে জড়িত সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাদের লড়ে যেতে হচ্ছে। পূর্ববঞ্চের সম্রান্ত পরিবারের সন্তান জগৎ সেন আজ কর্মহীন, পঙ্গু।

প্রতিবেশী ভূপতি বিদ্যাবাগীশের সংস্কৃত শিক্ষার টোল ছিল পূর্ববঙ্গে, বর্তমানে তার দিন চলে ধার করে আর সরকারি ভাতার আশায়। তাদের এখন একটাই পরিচয়—উদ্বাস্ত। বিদ্যাবাগীশ বলেন,

"খবরের কাগজ আমাগো কয় সর্বহারা, কয় উদ্বাস্ত। ভাবছনি কথাটা! পূর্ববঙ্গের পুরা হিন্দুগো নাম হইয়া গেছে উদ্বাস্ত। পচ্চিমবঙ্গে আমাগো নাম আছিল অ-মুসলমান, অখন হইছি উদ্বাস্ত।"<sup>৬০</sup>

তারা যা হতে পারেননি, তা হয়ে দেখিয়েছে জগৎ সেনের বোন সুপর্ণা। সে শিক্ষা-দীক্ষা বিসর্জন দিয়ে এক কংগ্রেসি গুণ্ডাকে বিয়ে করে আজ 'সুখী'। এখন সে তার 'বাঙাল' পরিচয় দিতে ঘৃণাবোধ করে। সত্যিই তো, এক অচিন দেশের নস্ট্যালজিয়া আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার কী মূল্য! আর যে মূল্যবোধ বা সংক্ষার নিয়ে জগৎ-অপর্ণারা চিন্তিত, ১৯৪৭-র ১৫ আগস্টের পর থেকে এই সমাজে তার কী মূল্য রয়েছে? বয়সে প্রাচীন বিদ্যাবাগীশ মশাই উদ্বাস্ত্তদের নতুন প্রজন্মের তথাকথিত অবক্ষয়ের দিকটি অস্বীকার করেন না। কিন্তু তিনি বলেন,

"আমি যদি আমার পিতৃ-পিতামহের বাড়ি পূর্ববঙ্গে আছিল বোইল্যা লজ্জা পাই, তয়তো আমারে স্বয়ম্ভূ হইতে হয়।"<sup>৬১</sup>

অন্যদিকে জগৎ সেনের মেয়ে বিনোদিনী অভাবের তাড়নায় পরিবারের অজান্তে হোটেলে কাজ নিয়েছিল। তার আয়ের উপায়টি তথাকথিত সমাজসিদ্ধ ছিল না। উদ্বাস্তজীবন তার মতো লক্ষ লক্ষ মেয়েকে সমাজের চোখে 'দূষিত' করে তুলেছে। মানুষের লোলুপতা বিনোদের জীবনে এক অনাহূত বিপদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। অপর্ণা সে-কথা জানতে পেরে পরিবারের 'মান-সম্মান' রক্ষার জন্য বিনোদকে বাড়ি ছেড়ে যেতে বলে। কিন্তু তাকে আশ্রয় দেয় বিদ্যাবাগীশ। কোন সমাজ? কীসের মান-সম্মান? যেদিন অপর্ণা সেনের মতো লক্ষ-লক্ষ পরিবার এক বস্ত্রে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল সেদিন সমাজ চোখে ঠুলি পড়েছিল। যেদিন শিয়ালদহে, রানাঘাটে, বেতিয়াতে সরকারি ক্যাম্পের নগ্ন আঁধারে উদ্বাস্তরা ধুঁকে ধুঁকে মরছিল সেদিন সমাজ তাদের 'মানসম্মান' নিয়ে ভাবেনি। তাঁর মতে যেদিন

বাঙালি দেশবিভাগকে মেনে নিয়েছিল, সেদিনই সমাজের রক্ত 'দূষিত' হয়েছিল। আজ সেই সমাজের জন্য তীব্র অভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শক্তিকে ক্ষুদ্র করে দেওয়া অন্যায়।

### দাঙ্গার চক্রান্তের নাটক 'দ্বীপ' :

উৎপল দন্তের 'দ্বীপ' নাটকটি ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা-পরিস্থিতির উপর ভিত্তি রচিত। নাটকে দেখানো হয়েছে কীভাবে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় সংবাদপত্রগুলি ভুয়ো খবর ছড়িয়ে দাঙ্গা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। 'প্রাক্তন' কমিউনিস্ট মিলন সরকার বর্তমানে বাংলার একটি বিখ্যাত সংবাদপত্রের সাংবাদিক। সম্পাদক, বার্তাসম্পাদক, সহ-সম্পাদকরা মিলে শিরোনাম ঠিক করেছে, "পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত মাছের ঝুড়িতে নরমুণ্ড।" মিলন তার নীতি-আদর্শ-বোধ ত্যাগ করে এই মিথ্যা কাহিনি লিখেছে। সে একটার জায়গায় তিনটে মৃতদেহের খবর লিখেছে। অর্থাৎ খবর ম্যানুফ্যাকচার করেছে। মিলনের সঙ্গিনী সুপ্রিয়া মুসলিমের ঘরে মানুষ হয়েছিল। তথাকথিত 'বেশ্যা' পরিচয় নিয়ে সে পাঁচশো টাকার বিনিময়ে দেহ বেচেছে, কিন্তু মিলন বেচেছে তার বুদ্ধি ও আদর্শ। সে জানে এই এক খবরে কলকাতায় দাঙ্গা বেঁধে যাবে। সে চোখের সামনে দেখতে পায় পরদিনের শিরোনামগুলি, "কলিকাতার দাঙ্গার জন্য মুসলমানরাই দায়ী", "এন্টালি এলাকায় মুসলমান গুণ্ডাদের সশস্ত্র আক্রমণ", "টালিগঞ্জে পাকিস্তানি গুপ্তচর ঘাঁটি আবিদ্ধার"।

মিলন নিজেকে বাধ্য করেছে এই ধরণের সংবাদ লিখতে। না লিখলে তার চাকরি চলে যাবে। সে যেন মালিকের 'হারেমের খাস বেশ্যা'। সুপ্রিয়ার চিন্তা তার বৃদ্ধ অন্ধ 'পিতা' মৌলবি সাহেবকে নিয়ে। টালিগঞ্জের হিন্দু পাড়ার মাঝখানে থাকা মৌলবি সাহেবের বিপদের কথা ভেবে সে শিউরে ওঠে। গত দাঙ্গায় মৌলবি সাহেবের স্ত্রী মারা গেছে। সুপ্রিয়া মিলনকে বলেছিল মালিকদের চক্রান্ত অন্য খবরের কাগজে ফাঁস করে দিতে। কিন্তু মিলন জানায় সে খবর অন্য সংবাদপত্রগুলি ছাপবে না, কারণ সবাই একই পথের পথিক।

এরপরে নাটকটিতে ছয়ের দশকের বাম-রাজনীতি, কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙন, মিলন সরকারের মতো কর্মীদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। পুলিশের গুলিতে তিনজন মৃত কমিউনিস্ট মিলনের স্বপ্নে তার দাঙ্গায় প্ররোচনা দেওয়ার শান্তি দিতে আসে। তারা জানিয়ে যায় টালিগঞ্জে মৌলবি সাহেবকে বাঁচাতে গিয়ে সুপ্রিয়ার মৃত্যু ঘটবে। আদর্শচ্যুত মিলন ভালোবাসার দায়ে সমস্ত চক্রান্ত ফাঁস করার জন্য নতুন করে কলম ধরে।

### দাঙ্গা-দেশভাগ—গণনাট্য সংঘ, দায়িত্ব এবং উত্তরদায় :

দেশভাগ ও উদ্বাস্ত পরিস্থিতি ধার্ক্বা সহ্য করার মতো শক্তি তৎকালীন বাঙালির ছিল না। তার কারণ, স্বতোৎসারিত কোনো চেতনা দেশভাগ ঘটায়নি এবং শুধু ইংরেজরা দেশভাগের জন্য দায়ী ছিল না। মৌলবাদের মানসিক বিকলতা বাঙালির শুদ্ধচিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। বহু সংগ্রামের পর চেনা পথে ফিরে এলেও ভাঙা দেশ জোড়া লাগেনি। বাস্তহারা সংগ্রামের সাফল্য যেমন আপামর বাঙালির গৌরবের বিষয়, তেমনই রাষ্ট্রের অমানবিক একদেশদর্শিতা ও একশ্রেণির বাঙালির বৈমাত্রেয় সুলভ আচরণও ইতিহাসের পাতাকে কলস্কিত করেছে। দেশভাগের সমস্ত অভিঘাত সমকালীন বাংলা সাহিত্য তার গর্ভে ধারণ করতে পারেননি। আঘাতের তীব্রতা বাংলা সাহিত্যকে বিমূঢ়, বিহ্বল করে দিয়েছিল। দেশভাগ ও উদ্বাস্ত পরিস্থিতির মতো জ্বলন্ত বিষয় নিয়ে গণনাট্য সংঘ তার 'রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা' যথার্থভাবে পালন করতে পারেনি। 'দলিল' নাটকের চূড়ান্ত মঞ্চসাফল্যের পরেও গণনাট্য সংঘ দেশভাগের জীবন নিয়ে খুব বেশি নাটক প্রযোজনা করেনি। 'দলিল' ও 'অপচয়' ভিন্ন যে নাটকগুলি প্রযোজনা করেছিল, সেগুলি পূর্বেই অন্য কোনো মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। উদ্বাস্ত ক্রাস্পের জীবন ও বাস্তহারা সংগ্রামের কাহিনিও নাটকে উঠে আসেনি। কমিউনিস্ট পার্টি ও গণনাট্য সংঘ বাস্তহারা সংগ্রামের সঙ্গে ওতথোত ভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও এই শূন্যতা বিশ্বয়কর।

তথ্যসূত্র :

- ১। সুমিত সরকার; আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০১৩, পৃ- ৩৩২
- V. P Menon; The General Elections, The Transfer of Power in India, Orient Longmans, 1957, p- 218-219
- ৩। প্রাগুক্ত, আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭, পৃ- ৩৬৮
- ৪। বদরুদ্দীন উমর; ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৯০, পৃ- ১১৮-১১৯
- ৫। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়; ছেচল্লিশের দাঙ্গা, র্য্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ২০০০, পৃ- ৩২

৬। তদেব, পৃ- ৪২

- ৭। অমলেন্দু সেনগুপ্ত; উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, প্রতিভাস, ২০০৬, পৃ- ১৬৫
- ৮। প্রাগুক্ত, ছেচল্লিশের দাঙ্গা, পৃ- ৮১
- ৯। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙ্গার সর্বনাশ রোধ কর, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯, পৃ- ৩৯২-৩৯৩
- ১০। মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত (সম্পাদনা); বাংলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্ত থেকে সংখ্যালঘুদের বাঁচার পথ, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, ষষ্ঠ খণ্ড, মনীষা, সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃ- ৯৮
- ১১। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়; দেশভাগ-দেশত্যাগ, অনুষ্টুপ, ২০২০, পৃ- ১৯
- ک۹ R. C Majumdar; History of the Freedom Movement in India, Firma K.L,
  Calcutta, 1963, p- 793
- ১৩। প্রাগুক্ত, The Transfer of Power in India, p- 413
- ১৪। প্রাগুক্ত, সংগ্রামের পথে বাংলা, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খণ্ড, পৃ- ৩৩৯

- ১৫। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী; প্রান্তিক মানব, দীপ প্রকাশন, ২০১৩, পৃ- ২৫
- ンシ Yasmin Khan; The Great Partitions : The Making of India and Pakistan, India Penguin, 2013, p- 155
- ১৭। প্রাগুক্ত, দেশভাগ-দেশত্যাগ, পৃ- ৬৭
- ১৮। প্রাগুক্ত, The Great Partitions : The Making of India and Pakistan, p- 155
- ১৯। প্রাগুক্ত, দেশভাগ-দেশত্যাগ, পৃ- ৭১
- ২০। তদেব, পৃ- ৭১
- ২১। প্রাগুক্ত, প্রান্তিক মানব, পৃ- ১৮
- ২২। তদেব, পৃ- ২৮
- ২৩। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়; উদ্বাস্ত, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬০, পৃ- ১৫৫
- ২৪। প্রাগুক্ত, প্রান্তিক মানব, পৃ- ১৯
- ২৫। শ্যামল চক্রবর্তী; ৬০-৭০ ছাত্র আন্দোলন, প্রথম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড,
  - ২০১১, পৃ- ১৫৩
- ২৬। প্রাগুক্ত, উদ্বাস্ত, পৃ- ৩১
- ২৭। প্রাগুক্ত, প্রান্তিক মানব, পৃ- ৯৫
- ২৮। তদেব, পৃ- ৯৬
- ২৯। তদেব, পৃ- ২৭
- ৩০। সরোজ চক্রবর্তী; মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে [সুরাওয়ার্দি থেকে বিধানচন্দ্র পর্যন্ত : ১৯৪৭-১৯৬২], প্রকাশক সরোজ চক্রবর্তী, ১৯৬৭, পৃ- ২০৪
- ৩১। প্রাগুক্ত, দেশভাগ-দেশত্যাগ, পৃ- ৭৭
- ৩২। প্রাগুক্ত, প্রান্তিক মানব, পৃ- ৫৬
- ৩৩। তদেব, পৃ- ৯০
- ৩৪। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য; হোমিওপ্যাথি, বহুরূপী, ৩৩ সংখ্যা

৩৫। বিজন ভট্টাচার্য; নবান্ন, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ- ১১৬

৩৬। জয়তী ঘোষ; দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনজিজ্ঞাসু মনন : এক দ্বন্দ্বাত্মক বিশ্লেষণ, পরিচয়,

কার্তিক-পৌষ ১৪১৫, ৪-৬ সংখ্যা, ৭৮ বর্ষ

- ৩৭। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; বাস্তুভিটা, দিয়া, অক্টোবর ২০১৬, পৃ- ১৭
- ৩৮। তদেব, পৃ- ২৫
- ৩৯। তদেব, পৃ- ৩৭
- ৪০। তদেব, পৃ- ৩৬
- ৪১। তদেব, পৃ- ৪৬
- ৪২। তদেব, পৃ- ২৩
- ৪৩। তদেব, পৃ- ৫৩
- ৪৪। তদেব, পৃ- ৫৩
- ৪৫। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; মশাল, পুস্তকালয়, ১৯৫৪, নিবেদন অংশ
- ৪৬। তদেব, পৃ- ৩
- ৪৭। তদেব, পৃ- ৩৯
- ৪৮। তদেব, নিবেদন
- ৪৯। সুরমা ঘটক; ঋত্বিক পদ্মা থেকে তিতাস, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি, ২০১০, পৃ- ৩০
- ৫০। ঋত্বিক ঘটক; দলিল, ঋত্বিক ঘটকের নাটকসংগ্রহ, (সংকলন ও সম্পাদনা- রথীন চক্রবর্তী), পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ২০০৮, পৃ- ৭৪
- ৫১। তদেব, পৃ- ৮১
- ৫২। তদেব, পৃ- ৯৩
- ৫৩। তদেব, পৃ- ১০০
- ৫৪। তদেব, পৃ- ১১২
- ৫৫। তদেব, পৃ- ৬৫

৫৬। তুলসীদাস লাহিড়ী; বাংলার মাটি, ডি. এম. লাইব্রেরি, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ- ১২

- ৫৭। তদেব, পৃ- ২৬
- ৫৮। তদেব, পৃ- ৬৬
- ৫৯। তদেব, পৃ- ৯২
- ৬০। বিধায়ক ভট্টাচার্য; উজান যাত্রা, একাঙ্ক সঞ্চয়ন (সম্পাদনা- ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য ও ড. অজিত কুমার ঘোষ), জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ- ২৪৪

৬১। তদেব, পৃ- ২৫৪

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# রাষ্ট্র, রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক

কার্ল মার্কসের শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্বে প্রলেতারিয়েত মানুষ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মূলত তিনটি রূপে : অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত। অর্থনৈতিক সংগ্রাম দৈনন্দিন আশুস্বার্থকে রক্ষা করার লড়াই। প্রতিটি অর্থনৈতিক সংগ্রাম বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রামের সোপান নির্মাণ করে। রাজনৈতিক সংগ্রামের মূল লক্ষ্য :

"—সামাজিক মুক্তি;

-পুঁজিতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার উৎসাদন;

–গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জন;

–শান্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা।"

শ্রমিক শ্রেণির মাইনে বৃদ্ধি, বকেয়া ভাতা আদায়, জীবনযাত্রার নিরাপত্তার দাবিতে ধর্মঘট কিংবা কৃষক শ্রেণির জমি ও ফসলের অধিকার, খাজনা ও বাজে আদায় বন্ধ, জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই অর্থনৈতিক সংগ্রামের অন্তর্গত। বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধির মতো অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষও পেটি-বুর্জোয়া দ্বন্দ্ব কাটিয়ে শ্রেণিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। ধারাবাহিক সংগ্রামের প্রভাবে বুর্জোয়া শাসক রাষ্ট্রের বিশেষ কিছু নীতি বদল করতে বাধ্য হলেও সামগ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পতন ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই কমিউনিজমের মূল উদ্দেশ্য।

ইংরেজ শাসিত ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ বা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত শিশু ভারত রাষ্ট্র—উভয়ক্ষেত্রেই শাসকদের সদিচ্ছার অভাব, নীতিগত ব্যর্থতা এবং প্রশাসনিক দুর্বলতা মানুষের জীবনে অসংখ্য বিপদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। প্রতিবাদ করলে রাষ্ট্র তার হিংস্র দাঁত-নখ নিয়ে আক্রমণ করেছে। তা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িকতা, উদ্বাস্তু পরিস্থিতি, খাদ্যসংকট, বস্ত্রসংকটের মতো সমস্যার বিরুদ্ধেও সর্বস্তরের মানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল। গণনাট্য সংঘের নাটকে যেমন অর্থনৈতিক সংগ্রামগুলিকে স্পর্ধিত উচ্চারণে তুলে ধরা হয়েছিল, তেমনই বেশ কয়েকটি নাটকে সরাসরি আঙুল তোলা হয়েছিল ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে। ভারতের শাসকের নীতিগত অবস্থানের দুর্বলতা এবং দমন-পীড়নকে চিহ্নিত করে গণনাট্য সংঘ নতুন সমাজব্যবস্থার প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে তুলতে চেয়েছিল। এই পরিচ্ছেদে আমরা সেই নাটকগুলিরই আলোচনা করব।

# মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব এবং ভারতবর্ষ :

মার্কসীয় তত্ত্বে প্রাচীন কালে রাষ্ট্রের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কৌমভিত্তিক সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা শ্রেণিবিন্যাস ছিল না। ক্রমে উৎপাদন ব্যবস্থার তারতম্যে ব্যক্তিগত সম্পদের অসাম্যের ফলে সৃষ্টি হয় শ্রেণি এবং শ্রেণিবৈরিতা। উৎপাদনী শক্তির প্রাচুর্যের অধিকারী এক শ্রেণির মানুমের শ্রেণিগত স্বার্থকে টিকিয়ে রাখার জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থার উৎপত্তি ঘটে। লেনিনের মতে রাষ্ট্র হল "A Product of the Irreconcilability of Class Antagonisms" এবং "an Instrument for the Exploitation of the Oppressed Class" <sup>1</sup> পুঁজিবাদী বিকাশের পরে উদ্ভূত বুর্জোয়া শ্রেণি শোষণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অন্য শ্রেণিকে অবদমিত করার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে। আমলাবাহিনী, পুলিশ, বিচারবিভাগের সাহায্যে দমনপীড়নের কাজটা রাষ্ট্রশক্তি সহজ করে নেয়। মার্কসীয় পরিভাষায় 'আমলাতন্ত্র' বলতে জনগণের উপরিস্থিত সুবিধাভোগী একটি বিশেষ স্তরকে বোঝানো হয়। রাষ্ট্রের একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রকে ছলেবলে রক্ষা করা এবং অবদমিত শ্রেণিগুলিকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সমস্ত উপাদান থেকে দুরে রাখা এদের উদ্দেশ্য।"

মার্কস তাঁর 'The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte' গ্রন্থে প্রলেতারিয়েতকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ডাক দেন। পারি কমিউনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর তত্ত্বের মিশ্রণে উঠে আসে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের ধারণা।<sup>8</sup> যে তত্ত্ব অনুযায়ী কৃষক-শ্রমিক প্রলেতারিয়েত শ্রেণির অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংগ্রাম পুঁজিবাদের পতনকে সুনিশ্চিত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। লেনিন বলছেন,

"Socialism means the abolition of classes. The dictatorship of the proletariat has done all it could to abolish classes. But classes cannot be abolished at one stroke.

And classes still remain and will remain in the era of the dictatorship of the proletariat. The dictatorship will become unnecessary when classes disappear. Without the dictatorship of the proletariat they will not disappear."<sup>¢</sup>

এঙ্গেলস তাঁর 'অ্যান্টি-ড্যুরিং' গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন যে 'প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব'-এর দ্বারা রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ঘটে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেই শ্রেণির কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। লেনিন এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেছিলেন।<sup>৬</sup> তাঁর মতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে বুর্জোয়া শাসক শ্রেণি পরাজয় স্বীকার না করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে হাত মেলায়। এই অবস্থাকে প্রতিরোধ করার জন্য শ্রমিক-কৃষকের মেহনতি বন্ধন দৃঢ় করা প্রয়োজন। এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার ফলে সমাজতন্ত্র থেকে উত্তরণ ঘটবে কমিউনিজমে, যেখানে রাষ্ট্রের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।

স্বাধীনতার পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রাথমিকভাবে কংগ্রেসকে সমর্থন করে শিশুরাষ্ট্র ভারতবর্ষকে নতুন করে গড়ে তোলার সংকল্প নিয়েছিল। যদিও স্বাধীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ব্যর্থতা ক্রমেই চোখে আঙুল দিয়ে মানুষের দুর্দশাগুলো দেখিয়ে দিতে থাকে। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কমিউনিস্ট পার্টি পুরনো নীতির বদলে 'ঝুটা স্বাধীনতা'র নীতি গ্রহণ করে। নতুন সম্পাদক
হন বি টি রণদিভে। যার প্রভাবে কমিউনিস্ট পার্টিসহ নয়টি সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হয়। তেভাগা-তেলেঙ্গানার আন্দোলন বন্দুকের নলের সামনে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। কৃষক রমণী গর্ভবতী অহল্যা বা সরোজিনী-বাতাসী-উত্তমীর রক্তে বাংলার মাটি ভিজে ওঠে। শহরে-গ্রামে পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও সমর্থকরা। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিও কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। গণনাট্য সংঘের উপরেও রাষ্ট্রীয় অত্যাচার নেমে আসে। তার মধ্যেও গণনাট্য নাট্যপ্রযোজনা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছিল।

#### নাটক—'পনেরোই আগস্টের পর' :

সজল রায়চৌধুরীর লেখা নাটকটির কাহিনি ছিল সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতা বিষয়ে একটি গ্রামের প্রবীণ-নবীনদের মধ্যে মতের বিতর্ক নিয়ে। প্রবীণরা স্বাধীনতালাভে উল্লসিত, কিন্তু যুবকদের প্রশ্ন তাহলে উদ্বাস্তদের এই অবস্থা কেন? যারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিল, তাঁরা আজ ধুঁকে ধুঁকে মরছে কেন? মূল্যবৃদ্ধি, ভগ্ন অর্থনীতি, কংগ্রেসি অত্যাচার, কৃষক-শ্রমিকদের দুর্দশা, বেকারত্বের মধ্যে দিয়ে এ-দেশ কোন অন্ধকারের দিকে এগোচ্ছে? এ তো 'পুরনো বোতলে নতুন মদ!' তরুণ প্রজন্ম এই মিথ্যা স্বাধীনতার ধামাধাড়িদের বদলানোর ডাক দেয়।

# ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণয়ন এবং প্রথম নির্বাচন :

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে স্বাধীন ভারতবর্ষে সংবিধান কার্যকরী হয়। সংবিধানের খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকর।

১৯৫০-এর ২৭ জানুয়ারি রাশিয়ার কমিনফর্মের মুখপত্র 'ফর এ লাস্টিং পিস অ্যান্ড ফর পিপলস ডেমোত্র্যাসি'-র সম্পাদকীয়তে বলা হয় ভারতে এখন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নয়।<sup>৭</sup> মুখপত্রে আরও বলা হয়,

"ভারতবর্ষ এমন স্তরে আছে যখনকার কর্মসূচি সশস্ত্র সংগ্রাম নয়। স্বরূপ উদ্ঘাটন অভিযানের উপরই আমাদের জোর দিতে হবে।"<sup>৮</sup>

দলিলটিতে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণির বিরুদ্ধে একটি বৃহত্তর যুক্তফ্রন্ট গঠনের উল্লেখ করা হয়। যে ফ্রন্টে শ্রমিক, ছোটো ও জমিদার নয় এমন কৃষক, জাতীয় বুর্জোয়া, সকল ধরণের মধ্যবিত্তকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়। স্বাভাবিকভাবেই রণদিভের 'সংকীর্ণতাবাদী' লাইন ও আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বের<sup>৯</sup> বিরুদ্ধে পার্টির মধ্যে আত্মসমালোচনা শুরু হয়। আন্তঃপার্টি সংগ্রামের পর পার্টির লাইন বদলে ফেলা হয়। অন্যদিকে ১৯৫১-র ৫ জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি আইনত স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে রাজ্যে ৩৪টি লোকসভা আসনের মধ্যে সিপিআই ৫টি আসনে জয়লাভ করে। বিধানসভার ২৩৮টি আসনের মধ্যে ৮৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২৮টি আসনে জয়লাভ করেছিল। বিপুল ভোটে জয়লাভ করে দেশের প্রধানমন্ত্রী হন জওহরলাল নেহরু ও রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলরূপে রাজ্যের প্রধান বিরোধী মুখ হয়ে ওঠে কমিউনিস্ট পার্টি।

## নির্বাচনী নাটক—'ভোটের ভেট' :

পানু পালের 'ভোটের ভেট' পথনাটিকাটি ১৯৫১-৫২ সালের নির্বাচনী প্রচারের জন্য রচিত হয়েছিল। কংগ্রেসি অপশাসনের বিষয়টি জনসমক্ষে তুলে ধরাই ছিল এই নাটিকার মূল উদ্দেশ্য। নাটকে চট পরিহিত দরিদ্র কৃষক পরাণ মণ্ডল তার মৃতপ্রায় নাতির সুস্থতার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। স্বাধীনতার পাঁচ বছর পরে এসেও তারা দারিদ্র্যের চরম পক্ষে নিমজ্জিত। অন্যদিকে কংগ্রেস নেতা নটবর এবং তার শাগরেদ বংশী পরিকল্পনা করে আগামী নির্বাচনে কীভাবে জয়লাভ করা যায়। তারা যেখানেই গেছে সব জায়গাতেই তাদের অসংখ্য প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। যার উত্তরে তারা

জানিয়েছে নেহরু ও কংগ্রেস সরকার দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিরাট বিরাট 'পরিকল্পনা' করেছে। খাদ্যসংকট সমাধানের ব্যাপারে জনগণের কাছে গিয়ে তারা বলার প্রস্তুতি নেয়,

"প্রফুল্লদার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলবে, বাঙালির খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা উচিত। কাঁচকলায় আছে বিশেষ পুষ্টিগুণ, ভিটামিনে ভরপুর। বাঙালি হয়ে উঠবে সবল জোয়ান। ভাত খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করলে ঘুচে যাবে 'ভেতো বাঙালি'র অপবাদ।"<sup>30</sup>

কিন্তু গরম গরম বক্তৃতা বা কাঁচকলার ভিটামিনে বুভুক্ষু মানুষের পেট ভরে না। কিংবা হাফ-প্যান্ট পরতে বললে বস্ত্র সমস্যার সমাধান হয় না। বরং এরকম উদ্ভট কথাবার্তায় মানুষের ক্ষোভ বৃদ্ধি পায়। বংশীর জবানিতে জানা যায়, কমিউনিস্টরা মানুষের ক্ষোভের ফসল ভোট-ব্যাঙ্কে তুলছে। স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ দেখে আর প্রাত্যহিক দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে যতীন, পরানরাও বোধিলাভ করেছে। যখনই তারা খাদ্যসংকট, বস্ত্রসংকট, চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলে তখনই তাদের 'কমুনিস্ট' বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়। অথচ ও পাড়ার গোলদার দুবছর কংগ্রেস করে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। তাই তারা ঠিক করেছে কৃষক সমিতির মত অনুযায়ী ভোট দেবে। তাদের বচসার মধ্যেই যতীনের শিশু সন্তান মারা যায়। ছোট্ট মৃতদেহটি কংগ্রেসি নেতাদের সামনে তুলে ধরে পরান বলে,

"বাবুরা ভোট নিতে এয়েছিলে না, ভোট নিতে এয়েছিলে... এই নাও, পাঁচ বছর ধরে যা দিয়েছ, নিয়ে যাও—"<sup>33</sup>

# গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ এবং 'গোলটেবিল' নাটক :

সংবাদমাধ্যমের কাজ দুর্বলের কণ্ঠস্বরকে সোচ্চার করে তুলে গণতন্ত্রের কাঠামোকে নিরাপদ রাখা। স্বাভাবিকভাবেই শাসক চায় সংবাদপত্রের শক্তিকে খর্ব করে তাকে ক্ষমতার প্রচারযন্ত্র করে তুলতে। কখনও বলপ্রয়োগ করে, কখনও বা বিবিধ প্রলোভনকে সামনে রেখে। সংবাদমাধ্যম যদি সততার আদর্শ ত্যাগ করে শাসকের হাতের পুতুল হয়ে ওঠে, তবে গণতন্ত্রের মৃত্যু অনিবার্য। দিগিন্দ্রচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'গোলটেবিল' একাঙ্কিকাটি সেরকমই একটি সংবাদপত্রের অসঙ্গতি এবং দায়িত্ববোধহীনতার উপর ভিত্তি রচিত। নাটিকাটিতে কোনো বিশেষ পত্রিকার উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও দিগিন্দ্রচন্দ্রকে আনন্দবাজার পত্রিকা কর্মচ্যুত করে। অথচ নাটককার দীর্ঘ ১৮ বছর আনন্দবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আনন্দবাজারের স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত তাদের 'প্রোপাগান্ডামূলক' সাংবাদিকতাকে আরও বেশি স্পষ্ট করে তোলে। সেই কারণেই নাটককার ভূমিকায় লিখেছেন 'ঠাকুর ঘরে কে?'

একান্ধিকাটির স্থান 'সত্য ভারত' পত্রিকার অফিস। যেখানে পত্রিকার ডিরেক্টর, ওয়ার্কস ম্যানেজার, সার্কুলেশন ম্যানেজার, চিফ রিপোর্টাররা পত্রিকার বিক্রি বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করছেন। সময়ে খবর না পৌঁছোনো, ফর্মা ছাড়তে দেরি হওয়া, ডাক ফেল করার মতো সমস্যায় পত্রিকাটি কম্পিটিশনের বাজারে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। পত্রিকা 'লসে রান' করছে। ব্যবসা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনে কমিউনিস্টদের দাবি-দাওয়াকে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অবশ্য যদি বেশি কমিউনিস্ট ঘেঁষা হয়ে যায়, তাহলে রাশ টেনে ধরতে হবে। সম্পাদকীয় লেখক জিতেনবাবুর কলমের প্রশংসায় সকলে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন।

সার্কুলেশন ম্যানেজার : ...কেমন কায়দা করে লিখচেন দেখুন তো। সব কথাই লিখচেন,

কিন্তু কিছুতেই ধরাছোঁয়া দিচ্ছেন না। কী অদ্ভুত মুন্সিয়ানা!"<sup>>></sup>

অর্থাৎ আদর্শের কোনো মূল্য নেই; 'বাজার'-এর গতি যেদিকে, সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে ছলেবলে অর্থলাভ করাই সংবাদপত্রের একমাত্র মোক্ষ। দেশের স্বাধীনতাও এদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ইংরেজদের বিরোধিতা করে সংবাদপত্রের গ্রাহক সংখ্যা পাঁচ হাজার থেকে ষাট হাজার করে তোলাই ছিল এদের মূল উদ্দেশ্য। নিউজ এডিটর তো স্পষ্ট বলেন, ''আজ কংগ্রেসি, কাল সোশ্যালিস্ট, পরশু মার্ক্সিস্ট! নিত্য নবরূপ। বহুরূপী, সোজা কথায় বহুরূপী।"

কিন্তু মূল সমস্যা হল কর্মীদের নিরুৎসাহতা। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির ফলে সামান্য মাইনেতে সকলের পক্ষেই সংসার চালানো মুশকিল হয়ে উঠছে। 'ডিউ ইনক্রিমেন্ট' আটকে আছে, বোনাসের কোনো

খবর নেই। অথচ ডিরেক্টর ও অন্যান্য কর্তাব্যক্তিরা দিব্যি ফুলে-ফেঁপে উঠছেন। অফিসের নীচু তলার কর্মচারীরা ইতোমধ্যেই 'ইউনিয়ন' গঠন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা যেটা পারে সেটা অফিসের নিউজ এডিটর বা সার্কুলেশন ম্যানেজাররা পারে না। তাদের মতে নিউজপেপার ইন্ড্রাস্ট্রি নয়, একটি পেট্রিয়টিক অর্গানাইজেশন। সেখানে ইউনিয়ন তৈরি হওয়া মানেই ধর্মঘট-লকআউট। নিউজ এডিটরের মতে,

"ইন্টেলেক্চুয়ালদের আবার ইউনিয়ন কী? ইউনিয়ন করবে মাথায় যাদের কিচ্ছু নেই, যারা আনঅ্যাডভান্সড, ব্যাকওয়ার্ড, অশিক্ষিত, স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার শক্তি যাঁদের নেই—তারা।"<sup>>৩</sup>

নাটককার শুধুমাত্র সংবাদপত্রের দৈন্যতা ও আদর্শহীনতাকে চিহ্নিত করে কাজ শেষ করেননি। নিউজ এডিটরের মতো শিক্ষিত পেটি-বুর্জোয়াদের 'ইন্টেলেকচুয়াল'-এর অহংকারকে চূর্ণ করেছেন। ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার প্রলোভনে এডিটর শেষ পর্যন্ত ইউনিয়নের আদর্শকে সমর্থন করতে পারেননি। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন, "কমিউনিজম এদেশে আসবেই... তা ঠেকানো যাবে না।" যে কারণে তাকে 'কমিউনিস্ট' হয়ে যাওয়ার গঞ্জনা শুনতে হয়। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সেই কারণেই বরখাস্ত করা হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে খবরের কাগজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলেই তিনি তাদের ভিতরকার দ্বিচারিতা এবং গ্লানির খোঁজ রাখতেন। যদিও সাধারণ জনতার পক্ষে নাটকের অন্তর্গত সংবাদপত্রের জটিলতা বোঝা কন্টকের এবং নাটকটি বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যের দিকেও এগিয়ে যায় না।

# দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—সাফল্য ও ব্যর্থতা :

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনা করা হয়। বাজেট ছিল প্রায় ২৩৭৮ কোটি টাকা। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল মূলত দুটি—১) যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা, ২) জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার

মূল লক্ষ্য ছিল ভারি শিল্প সৃষ্টি ও সরকারি সংস্থাগুলিকে (public sector) সম্প্রসারণ করা। যার মূল পরিকল্পক ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল প্রায় ৪৮০০ কোটি টাকা। জার্মানির সহায়তায় রাউরকেল্লায়, ইংল্যান্ডের সহায়তায় দুর্গাপুরে এবং রাশিয়ার সাহায্যে বোকারো-ভিলাইতে লৌহ-ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠে। কিন্তু বৈদেশিক পুঁজির উপর অতিনির্ভরতা এবং পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া দেশীয় বাজারে চাহিদা তৈরির চেষ্টায় পরিকল্পনা ক্ষতির মুখে পড়ে। বিদেশি পুঁজির উপর অত্যধিক নির্ভরতার কারণে কমিউনিস্ট পার্টি মনে করেছিল দ্বিতীয় পঞ্চবার্যিকী পরিকল্পনা 'পুঁজিবাদ বিকাশের চেষ্টারই একটা অবিচ্ছিন্ন অংশ'।<sup>১৪</sup> প্রাথমিকভাবে পার্টির পক্ষ থেকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্য্বিকীর সম্পূর্ণ বিরোধিতা করা হয়নি। পার্টির একটি দলিলে বলা হয়,

"পরিকল্পনাটির মধ্যে এমন কতগুলি নির্দিষ্ট বিষয় আছে যাহার মধ্য দিয়া সাম্রাজ্যবাদ ও বড়ো বড়ো পুঁজিপতির মধ্যেকার সংঘাত তীব্রভাবে প্রকটিত হয়। এই বিষয়গুলি কার্যকরী হইলে জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হইতে সুবিধা হইবে। তাই আমরা উহা সমর্থন করি। আবার এই পরিকল্পনাটিতেও এমন কতকগুলি বিষয় আছে, আমরা যাহার বিরোধিতা করি। ইহাদের মধ্যে অন্যতম সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়টি হইতেছে পরিকল্পনার আর্থিক সঙ্গতি এবং কী করিয়া এই অর্থ সংগ্রহ করা হইবে সে বিষয়ে।"<sup>১৫</sup>

কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিষয়ে আশাব্যঞ্জক ছিল কারণ রাশিয়ার সঙ্গে ভারত সরকারের গাঁটছড়া এবং শান্তিনীতির ফলে চিনের চৌ-এন-লাইয়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সখ্যতা। তবে ভারত সরকারকে অর্থের জোগানের সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। সেই সময় ভারত সরকার রাশিয়ার বদলে ইংল্যান্ডের উপরের বেশি নির্ভর করেছিল। এদিকে পরের বছরেই দেশের সাধারণ নির্বাচন। নেহরু সরকারের বিভিন্ন নীতি নিয়ে জনগণের মধ্যে উন্মা সৃষ্টি হয়েছিল। কয়েক মাসের মধ্যেই সিপিআই-এর বয়ানে 'পণ্ডিত নেহরুর সমাজতন্ত্র—একটি ভাঁওতা'<sup>১৬</sup> হয়ে যায়।

উন্নয়নের প্রক্রিয়া ধীর ও দীর্ঘমেয়াদী, অথচ সমস্যা অগুণিত। পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে বিরাট অঙ্কের ঘাটতি, ভূমিসংস্কার আইনের অপপ্রয়োগ, উচ্ছেদ বিলের নিষ্ঠুরতা, কারখানাগুলোয় শ্রমিক

ছাঁটাই-লক আউট, বেকার সমস্যা—সব মিলিয়ে তখন বিভিন্ন স্তরের বাঙালির জীবন জর্জরিত। ফলে পাঁচের দশকের মাঝামাঝি থেকে কলকাতায় একের পর এক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাকে। দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যৎকিঞ্চিত সাফল্য বাঙালি জীবনের সমস্যার কাছে বুদ্বুদের মতো উবে যায়। ১৯৫৩ সালের ট্রাম আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের শিক্ষক আন্দোলনের মতো অর্থনৈতিক সংগ্রাম তো ছিলই। পাশাপাশি কিছু রাজনৈতিক সংগ্রামেও বিপুল সংখ্যক বাঙালিকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। ১৯৫৫-র মে মাসে পর্তুগিজ শাসন থেকে গোয়াকে মুক্ত করবার জন্য বাংলা থেকে একটি দল পাঠানো হয়। 'গোয়া-মুক্তি আন্দোলন'-এর সত্যাগ্রহের সময় গোয়া পুলিশের গুলিতে বাংলার নিত্যানন্দ সাহা নিহত ও মহীতোষ নন্দী গুরুত্বর আহত হন। বাংলার বামপন্থী দলগুলি গোয়া মুক্তি আন্দোলনে কংগ্রেসি সরকারের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তোলে।<sup>১৭</sup>

১৯৫৬ সালের জানুয়ারিতে কংগ্রেস সরকার পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারকে একত্রিত করে 'পূর্বপ্রদেশ' নামে একটি রাজ্য গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা দলমত নির্বিশেষে সংযুক্তির সিদ্ধান্তকে ধিক্কার জানান। যার মধ্যে ছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী, গোপাল হালদার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কাজি আবদুল ওদুদ, শচীন সেনগুপ্ত প্রমুখ।<sup>১৮</sup> কমিউনিস্ট পার্টি মন্তব্য করে ''ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠী ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের বিরোধী এবং এককেন্দ্রিকতার পক্ষপাতী"।<sup>১৯</sup>

সুনীল দত্তের লেখা 'মালাবদল' ও 'শুভদৃষ্টি' নাটকদুটি ১৮ মার্চ মনুমেন্টের পাদদেশে একটি সাংস্কৃতিক সমাবেশে অভিনীত হয়। দুটি নাটকই বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক নাটক।

# পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যর্থতা—'দাও ফিরে সে অরণ্য' :

চিত্তরঞ্জন ঘোষের 'দাও ফিরে সে অরণ্য' নাটিকাটি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরবর্তী সময়কাল নিয়ে রচিত একটি ব্যঙ্গচিত্র। নাটিকাটির পটভূমি কোনো এক কল্পরাজ্য। যে দেশের রাজার কোমরে চওড়া কোমরবন্ধ, পায়ে নাগরা জুতো। তাঁর মাথায় "গাধার টুপির রাজ সংস্করণ"। আজ রাজা জীবনে

প্রথমবার চিন্তিত হয়েছেন। তার চিন্তার কারণ, "প্রজারা সব দেশের অতীত ঐতিহ্যের কথা ভুলে যাচ্ছে। দিন দিন তারা উচ্ছুঙ্খল হয়ে পড়ছে।" তাই তিনি চান দেশবাসীকে "দেশের পুরাতন ঐতিহ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে।" উপায় একটাই—প্রাচীন মুনি-ঋষিদের মতো দেশবাসীরাও অরণ্য জীবনে পুনরায় অভ্যস্ত হয়ে উঠুক। সারা দেশ জুড়ে বৃক্ষরোপণের জন্য তেত্রিশ কোটি সাত লক্ষ চোদ্দ হাজার তিনশো সাতান্ন টাকা বরাদ্দ করা হয়।

রাজা ভুলে গেছেন যে তার অত্যাচারে ইতিমধ্যেই দেশব্যাপী অরণ্যের আইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের মানুষ স্বেচ্ছায় শান্তিভঙ্গ করেনি, বরং খাদ্যসংকটের মতো সমস্যার কামড়ে তারা ক্রমশ প্রতিবাদী হয়ে উঠছে। মন্ত্রীমশাই জানিয়েছেন যে দামি দামি গাছ গোরু-ছাগলে খেয়ে গেছে, অথচ ভোটব্যাঙ্ক বজায় রাখার জন্য পবিত্র গোরুদের শান্তি দেওয়া যাবে না। অবশ্য ততদিনে রাজা-মন্ত্রী একটি সার সত্য বুঝে গেছেন—"না খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে, কিন্তু গাছ বাঁচতে পারে না।"

কিন্তু কতদিন? কতদিন বুভুক্ষু মানুষ অভুক্ত পেটে গাছেদের মতো নীরব হয়ে থাকবে? তেতাল্লিশের মন্বন্তরের দিন থেকে আজ পর্যন্ত তারা শুধু সহ্যই করে গেছে। অবশেষে তাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে। বাইশ পরগণা, মর্তমান কিংবা অবনীপুর জেলা থেকে হাজার হাজার নিরন্ন চাষি রাজার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য রাজধানীর উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। রাজমশাই আদেশ দেন 'অতীত ঐতিহ্যে নিষ্ঠাহীন উচ্ছুঙ্খল অবার্চীনদের' নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হোক। তার আদেশ মতোই শহরের চারদিকে সশস্ত্র প্রহরীর দৃঢ় অবরোধের ব্যবস্থা করা হয়। দেশের অর্থনীতিবিদ খোশনাবিশকে আদেশ দেওয়া হয় রাজার পরিকল্পনার সুফল বেতারে-কাগজে ছড়িয়ে দিয়ে মানুষের মগজ ধোলাই করার জন্য।

রাজ-প্রকল্পের সামান্য সুফলের ঢক্কানিনাদের সামনে চাপা দিয়ে দেওয়া হয় দেশের মানুষের দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অনাহার, মৃত্যুযন্ত্রণা। কিন্তু প্রমাণ হয়ে যায় "মানুষ না খেয়ে বেশ কিছুদিন বাঁচতে পারে, কিন্তু চিরকাল বাঁচতে পারে না।" ফলে এদেশে অরণ্য প্রতিষ্ঠার আর কোনো বাধা নেই। তবে তার আগে প্রয়োজন অরণ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যারা প্রাণত্যাগ করল তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। লক্ষ

লক্ষ নিরন্ন মানুষের খাদ্যের ব্যবস্থা করার থেকে একটি শহীদবেদীতে শ্রদ্ধা জানানো অনেক বেশি সহজ, রাজকীয়ও বটে। দ্রুত শহীদবেদী নির্মিত হয়, রাজামশাই অশ্রুসজল কণ্ঠে শহীদদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তার উচ্চকিত বক্তৃতা, তোষামোদকারী আমলাদের জয়ধ্বনির নীচে চাপা পড়ে যায় মানুষের আর্তনাদ।

নাটকটিতে পাঁচের দশকের খাদ্যসংকট, আমলাদের দুর্নীতি, নেহরু-বিধান রায়ের দায়িত্বহীনতার চিত্র ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে উঠে এসেছে। খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের 'ভাত না খাওয়ার পরামর্শ' কিংবা প্রশান্তচন্দ্র মহলনাবীশকে ব্যঙ্গ করে তৈরি খোশনাবীশ প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সময়ের বাস্তব প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরা হয়েছে।

## বামপন্থী সমাজতন্ত্রের পদধ্বনি এবং 'আজব দেশ' নাটক :

মন্মথ রায় তাঁর 'আজব দেশ' নাটকের ভূমিকায় এটিকে 'কিংবদন্তীমূলক কাল্পনিক নাটক' বলেছেন। বস্তুত হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রীর কর্মকাণ্ড দেখে কারোর বুঝতে অসুবিধা হয় না 'আজব দেশ' স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষ। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোর তলায় যে ভারতবর্ষ সাম্প্রদায়িকতা, দেশভাগ, উদ্বাস্ত পরিস্থিতি, ব্যর্থ ভূমিসংস্কার, খাদ্যসংকট নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়, এই নাটকে তারই কল্পচিত্র উঠে এসেছে। অথচ রাষ্ট্র এ সকল বিষয়ে নীরব। কোথাও স্বৈরতন্ত্রী সরকারের হাতে দিন-দুপুরে নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়। কোথাও বা সরকারের সদিচ্ছা থাকলেও দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাতন্ত্র ও নেতাদের কারণে পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হয় না। 'আজব দেশ'-এর অবস্থাও সেইরূপ। যে দেশের মন্দিরে সাধারণ মানুষের কোনো অধিকার নেই। যে দেশে খাদ্যের জন্য মানুষ 'নেকড়ে বাঘ'-এ পরিণত হয়। অথচ এ-দেশেই সমুদ্রের ঢেউ গুণে এক কর্মচারী 'ঘি-ভাত'-এর ব্যবস্থা করে ফেলে, মন্ত্রীর পরামর্শে ভাতের বদলে ঘাস রান্না হয়। একটি মৃতপ্রায় বিড়ালকে বাঁচানোর জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করা হয়, যা অসাধু রাজকর্মচারীরা আত্মসাৎ করে। অদৃশ্য বস্ত্র বিক্রির জন্য বিদেশি ব্যবসায়ীকে সরকার প্রকাশ্যে অর্থসাহায্য করে।

আজব দেশকে এই অন্ধকার থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে বিপ্লবী কৃষকনেতা কিষণচাঁদ। এ-দেশে যার নাম নিলেও শান্তি, যার মাথার দাম ধার্য করা হয়েছে পাঁচ হাজার মোহর। সে সব সত্ত্বেও কিষণচাঁদ দেশের মানুষকে নতুন মন্ত্র দিতে চেয়েছে 'আলো চাই—আরও আলো'। কিন্তু দীর্ঘদিনের অশিক্ষা আর কুসংস্কারে জর্জরিত দেশবাসীর পক্ষে নতুন মন্ত্র অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি। দেশবাসী বুঝতে পারেনি ভাত-কাপড়ের সংগ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বৃহত্তর রাজনৈতিক চেতনা। রাজ-চক্রান্তে যে চেতনার আলো মানুষের কাছে পৌঁছোয় না। এই আলো জ্ঞানের আলো, শিক্ষার আলো। অর্থনৈতিক শ্রেণিসংগ্রাম কীভাবে রাজনৈতিক বিপ্লবের মন্ত্রে পরিণত হতে পারে, নাটককার সেই তত্ত্বকেই রূপকের আকারে প্রকাশ করেছেন।

রাজকন্যা জয়ন্তীও প্রথমে কিষাণচাঁদের আলোর সন্ধানকে ভুল বুঝেছিলেন। ক্ষমতার অহংকারে জয়ন্তী চেয়েছিলেন অপরাজিতা থাকতে, চেয়েছিলেন দেশের সমস্ত কিছুই যেন তার নখদর্পণে থাকে। তিনি চেয়েছিলেন শক্তি আর বুদ্ধির পরীক্ষা। দেশের লোক বলত জয়ন্তী নাকি মানবী নয়, ছদ্মবেশী রাক্ষসী। কিন্তু কেউ কখনও রাজকন্যার হৃদয়ের খোঁজ নেয়নি। সবাই ব্যস্ত রাজ্য নিয়ে, ক্ষমতা নিয়ে। সবার আর্তনাদ রাজকন্যা শুনেছে, কিন্তু তার ভালোবাসার আর্তনাদ শুনবে কে? কিষণচাঁদ শুনেছিল—শুধু জ্ঞানের আলো দিয়ে নয়, ভালোবাসার আলো দিয়ে সে রাজকন্যাকে জয় করে নিয়েছিল।

রাজকন্যাকে জয় করে কিষণচাঁদ প্রকাশ্য রাজসভায় এসে দাঁড়ায়। রাজা-মন্ত্রী বুঝতে পারেন আলোর নিশাণের অর্থ বিদ্রোহের আগুন, বিপ্লবের স্পন্দন। রাজদ্রোহিতার অপরাধে কিষণচাঁদের প্রাণদণ্ড ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কিষণচাঁদ জানে তার মৃত্যু শান্তি নয়, নবজন্ম। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে, জয়ন্তীর মধ্যে তার জ্বেলে দেওয়া আগুন বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রাখবে। নির্ভীক কণ্ঠে সে বলে যায়,

"অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর কুসংস্কার—এ তিন অন্ধকারে দেশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে কে? তারা—যারা জনসাধারণকে শোষণ করতে চায়—অবাধে, নির্বিবাদে। দেশের মৃঢ়, স্লান,

মূক লোকের সংখ্যা যত বেশি থাকে—ততই তাদের শোষণের সুবিধা হয়। ভূতের মুখে রামনামের মতো তারাও বলেন—শিক্ষা চাই। কত সব পরিকল্পনার কথা আমরা শুনি। কিন্তু কী দেখি? যারা শেখাবে তাদের পেটে ভাত নেই। ভিটেমাটি বিক্রি করেও যারা যা কিছু শিখল—তাদের সে শিক্ষা কাজে লাগাবার সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেই। দেশের আজ এই যে অবস্থা এতে সুবিধা হয়েছে কার? ঐ গবুচন্দ্র দাসের। শুধু গবুচন্দ্র দাস নয়—গবুচন্দ্র গোষ্ঠীর।"<sup>২০</sup>

স্পষ্টতই দেশের দুরবস্থার জন্য কিষণচাঁদ তথা নাটককার আমলাতন্ত্রকেই দায়ী করেন। হবুচন্দ্র রাজা টেরও পাননি, তার নাকের তলায় তারই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল পাকানো হচ্ছে। শেষে হবুচন্দ্র রাজা রাজদণ্ড ত্যাগ করে কিষণচাঁদের হাতে রাজত্ব সমর্পণ করেন।

কে এই কল্পরাজ্যের কিষণচাঁদ? জয়ন্তী বা হবুচন্দ্র রাজারই বা বান্তব পরিচয় কী? নাটককার চরিত্রগুলির মাধ্যমে রূপকের আড়ালে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের পরিচয় দেন। যেখানে জয়ন্তী এই দেশের মাটি, দেশের আত্মা; হবুচন্দ্র রাষ্ট্রব্যবস্থা ও গবুচন্দ্র আমলাতন্ত্র। আমলাতন্ত্রের অত্যাচারেই যন্ত্রণায় বিদ্ধ হচ্ছে দেশের মানুষ; একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপের খেলায় মেতে উঠছে। তাই প্রয়োজন নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার, প্রয়োজন নতুন নেতা কিষণচাঁদের। নামের গুণেই যে কৃষকদের প্রতিনিধি। তার নিজের মুখে তার পরিচয়,

"আমি এই অভিশপ্ত রাজ্যেরই এক অতি সাধারণ প্রজা। আমি সেই বংশেই জন্মেছি— যারা সবার পিছনে থেকে, সবার নীচে দাঁড়িয়ে—কুশিক্ষা, দারিদ্র্য আর অর্ধাশনে তিল তিল করে মরণের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে—যাদের শোষণ করে রাজ্যের মুষ্টিমেয় স্বার্থাম্বেষীরা ক্রমশ ফেঁপে উঠছে। আমি এই দেশেরই সেই নিপীড়িত প্রজাদের একজন মহারাজা। চাটুকার আর চক্রান্তবাজদের বেড়াজাল ডিঙিয়ে যাদের অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনি মহারাজের কাছে পোঁছোতে পারে না—আমি সেই শোষিত প্রজাকূলেরই একজন মহারাজ।

আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না কিষণচাঁদ আদতে বাংলার বুকে ক্রমবর্ধমান বামপন্থী শক্তিদের প্রতীক। জয়ন্তীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকালে সে ছদ্মনাম নিয়েছিল 'সূর্যলাল'। আমলাতন্ত্রের প্রতিভূ গবুচন্দ্র মন্ত্রী দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়, দেশের আত্মা জয়ন্তী কিষণচাঁদকে বরণ করে নেয় এবং হবুচন্দ্র রাজাও শান্তিপূর্ণ পথে সসম্মানে তার হাতে রাষ্ট্রশক্তি ছেড়ে দেন। নাটককারও এদেশের বুকে সমাগত বামপন্থী সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থার দেওয়াল লিখন স্পষ্ট করে দেন।

যদিও সেই ভবিষ্যত নির্মাণে তিনি জনতার ভূমিকা প্রায় গুরুত্বহীন করে দিয়েছেন। যার সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ডাকের সাযুজ্য পাওয়া যেতে পারে। হবুচন্দ্র রাজাকে অবুঝ, হাস্যকর ও শেষে আমলাতন্ত্রের জালে আবদ্ধ অসহায় নিরপরাধ চরিত্র রূপে নির্মাণ করে তিনি রাষ্ট্রশক্তির অত্যাচারী ক্ষমতাকে ছোটো করে দেখেছেন।

# চিন-ভারত সীমান্ত সমস্যা, ভারতরক্ষা আইন এবং রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন :

ভারতবর্ষের শান্তিনীতি সত্ত্বেও ১৯৫৬-৫৭ সালে আকসাই অঞ্চল নিয়ে চিনের সঙ্গে বিবাদ শুরু হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে চৌ-এন-লাই-এর দীর্ঘ পত্রালাপের পরেও এই সমস্যার যথার্থ সমাধানসূত্র পাওয়া যায়নি। ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে চিন ম্যাকমোহন লাইন অতিক্রম করে ভারতের সীমান্তবর্তী অনেকটা অঞ্চল দখল করে নেয়। শুরু হয় চিন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ। স্বভাবতই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলা আদর্শগত অন্তর্দ্বন্দ্ব চিন-ভারত সংঘর্ষকে ঘিরে ব্যাপক আকার ধারণ করে। কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ ভূপেশ গুপ্ত স্পষ্টভাষায় জানান চিনই ভারতের সীমানা অতিক্রম করেছে এবং জাতীয় ঐক্য ও প্রতিরক্ষার খাতিরে দলমত নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর প্রধানমন্ত্রী নেহরুর পাশে দাঁড়ানো উচিত।<sup>২২</sup> অন্যদিকে আরেক দল মনে করতেন ভারত 'প্ররোচনাদাতা'। জ্যোতি বসুসহ বাংলার প্রাদেশিক সংগঠনের অনেকেই 'প্ররোচনা'র তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল যুদ্ধ নয়, আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান প্রয়োজন।<sup>২৩</sup>

যুদ্ধের পরিস্থিতিতে 'ভারতরক্ষা আইন' জারি হয়। তার সঙ্গে যুক্ত হয় নির্বতনমূলক আটক আইন, ১৪৪ ধারা, ১০৭ ধারা ইত্যাদি। ১৯৬১-৬২ সালের বাজেট অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন এবং নিবর্তনমূলক আটক আইনের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হয় যথাক্রমে তিন বছর ও পাঁচ বছর।<sup>২৪</sup> যেহেতু একটি বিশেষ অংশের কমিউনিস্টরা সীমান্ত সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে নেহরুর নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তারাই হয়ে উঠলেন আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। কমিউনিস্ট পার্টির মোট ৯০০ জন সদস্য-সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ ও 'জাতীয়তাবাদী' কর্মীদের তাণ্ডবে বিভিন্ন পার্টি অফিস, গণসংগঠনের দপ্তর, পার্টি পত্রিকার দপ্তর ভেঙে ফেলা হয়। শারীরিক ভাবে নির্যাতিত হতে হয় কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তি ও তাদের পরিবারবর্গকে। সীমান্ত চিনের বিরোধিতা দেশের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট বিরোধিতায় পর্যবসিত হয়।

চিন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ, পার্টির মধ্যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব এবং রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন থেকে জন্ম নেওয়া অবিশ্বাস-ঘৃণা-বিদ্বেষ কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনকে নিশ্চিত করে তুলেছিল। অবশেষে ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে অন্ধ্রপ্রদেশের তেনালিতে কনভেনশনে পার্টি ভাঙার কাজ সমাপ্ত হয়। ১৯৬৫-র মার্চে কেরালার নির্বাচনে 'কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া' (মার্ক্সিস্ট) এবং 'কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া' নামে দুটি দল আলাদা ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

#### রাদ্রীয় উৎপীড়নের নাটক 'সন্ত্রাস' :

ব্রেশটের 'দ্য ইনফর্মার' অবলম্বনে রচিত চিররঞ্জন দাসের 'সন্ত্রাস' নাটকটি ছয়ের দশকে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন মানুষদের দমবন্ধ পরিস্থিতির সাক্ষী। এখানে অবশ্য 'কমিউনিস্ট' বলতে সিপিআই-এর বাংলা প্রাদেশিক কমিটির লাইনে বিশ্বাসী মানুষদের কথাই বোঝানো হয়েছে। নাটকের ভূমিকায় নাটককার জানান,

"রাজনৈতিক ডামাডোল, উগ্র জাত্যাভিমান এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র সম্পর্কে যখন জনগণের মনের মধ্যে কদর্য বিষ ঢুকিয়ে এ দেশের শুভবুদ্ধি ও গণতান্ত্রিক চেতনাকে স্তব্ধ করার এক কুৎসিত বিপজ্জনক খেলা চলছিল ঠিক তখনই এই নাটক মঞ্চস্থ হয়।"<sup>২৫</sup>

নাটকের সময়কাল ১৯৬২ সালের শেষ মাস। অর্থাৎ কিছুদিন আগেই ভারত-চিন সীমান্তে সংঘর্ষ হয়ে গেছে। কিন্তু ভারতরক্ষা আইন, নিরাপত্তা আইনের 'ডাইনি-খোঁজা' তখনও বর্তমান রয়েছে। লোকনাথ দত্ত একটি কলেজের প্রফেসর, যিনি বিশ্বাস করেন সীমান্ত সমস্যা নিয়ে মানুষের উদ্দাম জাতীয়তাবাদের আগে দেশের মেরুদণ্ড গঠন করা উচিত। তাঁর মনে হয় সীমান্ত সমস্যার অনড়-অটল অবস্থা দেশের অভ্যন্তরে ভীতিকর অবস্থা সৃষ্টি করেছে। তিনি সন্দেহ করেন সরকারবিরোধী বিশ্বাসের জন্য তাঁকে 'দেশদ্রোহী' প্রমাণ করতে সকলে উঠেপড়ে লেগেছে। তিনি কারোর বাড়ি যান না, কারোর সঙ্গে দেখা করেন না; কলেজে বা সামাজিক মেলামেশায় নিজস্ব মতামত রাখেন না। বন্ধু চৌধুরীবাবুর ফোন এলে তিনি চাকর রামুকে দিয়ে জানিয়ে দেন তাঁরা বাড়িতে নেই। কারণ কোনো এক অনির্দিষ্ট কারণে পুলিশের লোক চৌধুরীবাবুদের পিছনে পড়েছে।

মুখে যদিও তিনি বলেন, "স্বাধীন দেশের নাগরিক আমি। নিজের বাড়িতে আমার স্বাধীনতা আছে। এখানে বাইরের কারো জারিজুরি খাটবে না—" কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি রাষ্ট্রব্যবস্থা বা রাষ্ট্রীয় উৎপীড়ন নিয়ে করা মন্তব্যগুলি ঢোঁক গিলে ফেলেন। ভয় থেকে জন্ম নেওয়া অবিশ্বাস এত গভীরে পোঁছে গেছে যে তিনি অতীতে বামপন্থার আদর্শ নিয়ে যত কথা বলেছেন বা রাষ্ট্রব্যবস্থার দুর্বলতা নিয়ে যত মন্তব্য করেছেন, সব মুছে ফেলতে চান। তিনি ও তাঁর স্ত্রী ইলা দেবী দুজনে মিলে একের পর এক যুক্তি সাজান। "কংগ্রেসি রাজত্বে বাস করা যাবে না" কথাটা হয়ে যায় "পাঁচা দেশে বাস করা যাবে না"। প্রতিটি কথার আগে 'হয়তো', 'এমন', 'লোকে বলে' প্রভৃতি অনির্দিষ্টবাচক শব্দ বসিয়ে নিজেদের বিবেককে বোকা বানাতে চান। লোকনাথবাবু ঘর থেকে 'ক্যাপিটাল' বইটা সরিয়ে ফেলেন, জওহরলাল নেহরুর পুরনো ছবি সামনের ঘরে নিয়ে আসেন। তিনি কলেজেও আজকাল মার্কসীয় অর্থনীতি সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত ভুল ধারণা দেন।

কিন্তু তাতেও ভীতির পরিবেশ থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। তাঁর শেষ সন্দেহের তীর গিয়ে পড়ে তাঁদের দশ বছরের সন্তান বাবলার ওপর। তাঁদের মনে হয় বাবলা হয়তো ঘরের আলোচনা বাইরে ফাঁস করে দিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করানোর ষড়যন্ত্রে যুক্ত আছে। এমনিতেও বাবলার মধ্যে স্বদেশিভাব প্রবল। স্থানীয় প্রতিরক্ষা সমিতির জাতীয়তাবাদী কাজকর্ম সম্পর্কে তার উৎসাহ আছে। 'দেশদ্রোহী' হওয়ার ভয়ে লোকনাথবাবু কখনও সে বিষয়ে বাধা দেননি। এরই মধ্যে তাঁদের অজান্তে বাবলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তাঁদের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হয়। লোকনাথবাবুর মনে পড়ে দশ-বারো দিন আগে সামান্য ব্যাপার নিয়ে তিনি বাবলাকে একটু মেরেছিলেন। হয়তো তারই প্রতিহিংসায় বাবলা তার বাবা-মাকে ফাঁসিয়ে দিতে চাইছে। জনৈক অথিলবাবু এরকমই একটি ঘটনার কথা লোকনাথবাবুকে বলেছিলেন। সেখানে একটি ছেলের সাক্ষ্যতে তার নির্দোষ বাবা বিনা বিচারে জেল খাটছে। ভয়ে-ক্ষোভে-অসহায়তায় তিনি চিৎকার করে ওঠেন,

"আমারই বিন্দু বিন্দু রক্তে তৈরি সন্তান, আদালতে গিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমারই বিরুদ্ধে অটল হয়ে সাক্ষী দিচ্ছে। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে আমাকে, দেশদ্রোহী বলে প্রমাণ করছে। ওহ্, এ দৃশ্য আমি দেখতে পারব না।"<sup>২৬</sup>

তখনই বাবলা ফিরে আসে। সে দোকানে গিয়েছিল বিস্কুট কিনতে। লোকনাথবাবু ও ইলাদেবী হতভম্ব হয়ে যান। কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন না। বাবলা কি আদৌ সত্যি বলছে, নাকি মিথ্যা বলে শুধুই জল মাপছে? পিতা-পুত্রের সম্পর্ক বিষিয়ে তোলা এক তিক্ত সন্দেহের দমবন্ধ অবস্থায় নাটকটি শেষ হয়। আশ্চর্য হওয়ার কারণ নেই কেন নাটকটি অভিনয়কালে পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনী এসে উপদ্রব করেছিল!

উৎপল দত্তের 'সংকট মুহূর্ত'-এর বাস্তবতা আরও জ্বলন্ত ও মর্মান্তিক। নাটকটি যদিও গণনাট্য সংঘ অভিনয় করেনি, কিন্তু ১৯৬৪ সালে গণনাট্য পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় নাটকটি প্রকাশিত হয়েছিল। চিনের আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশের নিরাপত্তার সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল শহরের মস্তানদলরা। সেরকমই একদল গুণ্ডাদলের হাতে সরকারবিরোধী বুদ্ধিজীবী ভবেন ঘোষের আত্মসমর্পণের কাহিনি

'সংকট মুহূর্ত'। এ নাটক শুধু আত্মার সংকটের নাটক নয়, বরং প্রবল প্রতিপক্ষের অত্যচারের সামনে অসহায় আপসের নাটক। এই দুটি নাটক থেকে তৎকালীন পরস্থিতিতে গণনাট্য সংঘের নীতিগত অবস্থানের আঁচ পাওয়া যায়।

আমাদের আলোচ্য সময়কালে গণনাট্য সংঘের খুব বেশি নাটকে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় দমনপীড়নের প্রত্যক্ষ চিত্র উঠে আসেনি। তখনও বাংলায় বামপন্থী শক্তিগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের সম্পূর্ণ রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। শ্রেণিসংগ্রামকে কীভাবে অর্থনৈতিক থেকে রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত করা যায় তা নিয়েও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দ্বিধা ছিল। আবার পাঁচের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে সংঘের মধ্যে একটা স্থিতাবস্থা তৈরি হয়। ফলে নাটকে বামপন্থী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার বদলে শাসকের স্বরূপ উদঘাটনই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। ছয় ও সাতের দশকে যুক্তফ্রন্ট সরকার, নকশাল আন্দোলন, জরুরি অবস্থার পর বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের ক্ষমতায় আসে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক শাখা সংগঠনের মতো গণনাট্য সংঘও পার্টির রাজনৈতিক সংকট ও সংসদীয় উত্তরণকে মহিমান্বিত করে তোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সমগ্র সাতের দশক জুড়ে বাংলা, ভারতবর্ষ এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছিল গণনাট্য সংঘের একপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে তার সার্বিক মহিমা অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি।

#### তথ্যসূত্র :

- ১। আ. ইয়ের্মাকোভা, ভ. রাত্নিকভ; শ্রেণি ও শ্রেণিসংগ্রাম, (অনুবাদ- ননী ভৌমিক), প্রগতি প্রকাশন, মক্ষো, ১৯৮৮, পূ- ১২
- V.I. Lenin; The State and Revolution, The Marxist Theory of the State & the Tasks of the Proletariat in the Revolution, August-September 1917, Lenin, Collected Works, Volume 25, (edited & translated by Stepan Apresyan & Jim Riordan), Progress Publishers, Moscow, 1974, p- 390, 396.

৩। প্রাগুক্ত, শ্রেণি ও শ্রেণিসংগ্রাম, পৃ- ২৪০

- 8 Karl Marx; The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, Karl Marx and Frederick Engels Selected Works, Volume 1, Progress Publishers, Moscow, second edition 1973, P- 398
- V.I. Lenin; Economics and Politics in the Era of the Dictatorship of the Proletariat, September-October 1919, Lenin, Collected Works, Volume 30, (edited & translated by George Hanna), Progress Publishers, Moscow, 1974, p- 114-115
- ৬। প্রাগুক্ত, The State and Revolution, The Marxist Theory of the State & the Tasks of the Proletariat in the Revolution, August-September 1917, Lenin, Collected Works, Volume 25, p- 401
- ৭। ভানুদেব দত্ত; অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাংলা প্রেক্ষাপট : ভারত, মনীষা, ২০১৫, পৃ-১৩৭
- ৮। মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত (সম্পাদনা); ভারতের জনতার গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান কর্তব্য, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, ষষ্ঠ খণ্ড, মনীষা, সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃ- ১৯০
- ৯। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯, পৃ- ২১১ ১০। পানু পাল; ভোটের ভেট, গ্রুপ থিয়েটার, ২৬ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ফেব্রু-এপ্রিল ২০০৩-০৪, পৃ-

২৩৬-২৩৭

- ১১। তদেব, পৃ- ২৩৯
- ১২। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; গোলটেবিল, পুস্তকালয়, সেপ্টেম্বর ১৯৫৩, পৃ- ১৬ ১৩। তদেব, পৃ- ২৩

১৪। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); পার্টি চিঠি ৩, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮, পৃ- ১২৬

১৫। তদেব, পৃ- ১২৮

- ১৬। মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত (সম্পাদনা); পণ্ডিত নেহরুর সমাজতন্ত্র—একটি ভাঁওতা, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, অষ্টম খণ্ড, মনীষা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ-২৬৬
- ১৭। প্রাগুক্ত, ১৯৫৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ (গোয়েন্দা বিভাগের গোপন রিপোর্ট থেকে), বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খণ্ড, পৃ- ১৮৮-১৮৯
- ১৮। প্রাগুক্ত, বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে সভা, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খণ্ড, পৃ- ২১৬

১৯। তদেব, পৃ- ১৯৫

২০। মন্মথ রায়; আজব দেশ, মন্মথ রায়ের নাটক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পু- ২৭১-২৭২

২১। তদেব, পৃ- ২৬৮-২৬৯

- ২২। মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত (সম্পাদনা); ভারত-চিন সীমান্ত সংঘর্ষ, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, দ্বাদশ খণ্ড, মনীষা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ- ৪০৪
- ২৩। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); দ্বন্দ্বে দীর্ণ দিনগুলি, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, চতুর্থ খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫, পৃ- ১৫৩
- ২৪। প্রাগুক্ত, পশ্চিমবাংলার আসন্ন সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্যে কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ- ২৭৭

২৫। চিররঞ্জন দাস; সন্ত্রাস, সংগ্রামের নাটক, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, বৈশাখ ১৩৭৮, পূর্বকথা ২৬। তদেব, পৃ- ২৫

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# গণনাট্য সংঘের নাটকে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আদর্শ ছিল বিশ্বমানবতাবাদ। ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তুলে ধরার পাশাপাশি তাদের নাটকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। এই পরিচ্ছেদে আমরা গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'বিশে জুন', চিররঞ্জন দাসের 'ভিয়েতনাম' ও 'মৃত্যুহীন' নাটক তিনটি আলোচনা করব। তিনটি নাটকেই আমেরিকার পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতার দিকে আঙুল তোলা হয়েছে। 'ঠাণ্ডাযুদ্ধ'-এর কালে বামপন্থী চেতনায় সমৃদ্ধ গণনাট্য সংঘের আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গের নাটকে যা প্রত্যাশিত ছিল।

# রোজেনবার্গ দম্পতির হত্যাকাণ্ড—'বিশে জুন' নাটক :

১৯৫৩-র ২০ জুন আমেরিকা সরকারের আদেশে জুলিয়াস রোজেনবার্গ ও তাঁর স্ত্রী এথেল রোজেনবার্গকে ইলেকট্রিক চেয়ারে মৃত্যুদণ্ড পেতে হয়। দুজনের বিরুদ্ধেই গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ ছিল। আমেরিকার পরমাণু বোমার গুপ্ত সংবাদ তারা নাকি রাশিয়ার কাছে ফাঁস করে দিয়েছিলেন। দুজনেই তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। তৎকালে অনেকেই মনে করতেন আমেরিকার কমিউনিস্ট-ভীতির কারণেই তাঁদের চরম শাস্তিভোগ করতে হয়েছিল। অনেকের কাছে তাঁরা ছিলেন এ-যুগের রোমিও-জুলিয়েট। ভয়ঙ্কর মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও তাঁদের প্রেমের শক্তি বিন্দুমাত্র টাল খায়নি।

তাঁদের প্রেমকাহিনি শুরু হয়েছিল ১৯৩৬ সালে। ১৯৩৯ সালে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। জন্মগতভাবে দুজনেই ছিলেন ইহুদি আমেরিকান। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জুলিয়াস রোজেনবার্গ আমেরিকান যুদ্ধবিভাগের বিশেষ গবেষণা দপ্তরে চাকরি পান। পূর্বে আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য থাকার কারণে ১৯৪৫ সালে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

১৯৪৯ সালে রাশিয়া তাদের প্রথম পারমাণবিক বোমা পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করে। রাশিয়ার পরমাণু শক্তি পরীক্ষা আমেরিকাকে চিন্তায় ফেলে দেয়। ১৯৫০ সালে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা জার্মান বিজ্ঞানী ক্লাউস ফুকস, হ্যারি গোল্ড ও ডেভিড গ্রিনগ্লাসকে গ্রেপ্তার করে। ডেভিড গ্রিনগ্লাস ছিলেন এথেলের ভাই। জেরায় ডেভিড জানান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 'ম্যানহাটান প্রজেক্ট'-এর পরমাণু গবেষণা সংক্রান্ত গুপ্ততথ্য পাচারে জুলিয়াস ও এথেলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে বিচারক আর্ভিং কাউফম্যানের অধীনে জুলিয়াস ও এথেলের বিচার শুরু হয়। তাঁদের পক্ষের উকিল ইমানুয়েল ব্লকের চেষ্টা সত্ত্বেও এপ্রিল মাসে রোজেনবার্গ দম্পতিকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়।

এত বড়ো একটা 'ষড়যন্ত্র'-এর জন্য মাত্র এক মাসের বিচারে মৃত্যুদণ্ড। ইলেকট্রিক চেয়ারে মৃত্যুদণ্ডের নৃশংস পদ্ধতিকে অনেকে মানবতার হত্যা বলে মনে করেছিলেন। বিশ্বের বহু মানুষ রোজেনবার্গদের শান্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। সেই তালিকায় নাম ছিল জঁ পল সাত্র, জন কঁকতো, আলবার্ট আইনস্টাইন, বের্টোল্ট ব্রেশট, ফ্রিদা কালহো, পাবলো পিকাসো প্রমুখের। এমনকি পোপ দ্বাদশ পিয়াস আমেরিকার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ারের কাছে মৃত্যুদণ্ড রদ করার আবেদন জানিয়েছিলেন।<sup>2</sup> কিন্তু সমস্ত আবেদন নাকচ করে তাঁদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ বহাল থাকে। অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়াও তাঁদেরকে 'গুপ্তচর' বলে মেনে নেয়নি।

রোজেনবার্গ দম্পতির জীবনের শেষ তিন ঘন্টা নিয়ে রচিত হাঙ্গেরিয় নাটককার মিকলস জিয়ারফাসের নাটকটিকে 'বিশে জুন' নামে বাংলা অনুবাদ করেন বীরু মুখোপাধ্যায়। তিন অঙ্কের নাটকটি ১৯৫৪ সালে গণনাট্য সংঘ দ্বারা মঞ্চস্থ হয়। নাটকের প্রথম অঙ্কের সূত্রপাত ঘটে নিউ

ইয়র্কের সিং সিং কারাগারে, যেখানে একা বন্দী জুলিয়াস রোজেনবার্গ। আর ঘন্টা তিনেক পরেই তাঁকে ইলেকট্রিক চেয়ারে মৃত্যু পেতে হবে। জেল ওয়ার্ডেন বর্ষীয়ান ডেভিস পিভি জানায় জুলিয়াসের মতো আরও অনেক মৃত্যুদণ্ডের আসামী এই ঘরে বন্দী ছিল। এথেল রোজেনবার্গকেও নিয়ে আসা হয় এই কক্ষে। দশদিন তাঁরা একে অপরকে দেখেননি। তাঁদের দুই সন্তান রবার্ট আর মাইকেলের সঙ্গেও দেখা করতে দেওয়া হয়নি। উকিল ইমানুয়েল ব্লক আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তাঁদের মুক্তির জন্য। আজ তিনি সন্তানদের নিয়ে আমেরিকান রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ারের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। এথেল আশাবাদী হয়তো প্রেসিডেন্ট ভুল বুঝতে পেরে তাঁদের মৃত্যুর আদেশ রদ করে দেবেন। আন্তর্জাতিক শান্তি সংস্থা তাঁদের মুক্তি চেয়েছে। চিঠির বন্যায় বিচারবিভাগ ভেসে যাচ্ছে। দশহাজার লোক হোয়াইট হাউসের সামনে বিক্ষোভ করেছে। হাজারো মানুষ্বের মুষ্ঠিবদ্ধ হাতের প্রতিবাদী ধ্লোগানে জুলিয়াস শুনতে পান বিটোভেনের সুর। এথেল স্বপ্ন দেখেছেন তাঁর ভাই ডেভিড মিথ্যা সাক্ষ্যের কথা স্বীকার করে নিয়েছে।

মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তাঁরা জীবনের প্রতি বিশ্বাসী। তাঁদের মনে পড়ে পুরনো বাড়ির কথা। একটা সুন্দর পুরনো বাড়ি, বাগান ভর্তি আপেল গাছ, বাগানের নিচে একটা ছোটো নদী, রবার্ট আর মাইকেল তার ধারে খেলছে। এথেল জুলিয়াসের বাড়ি ফেরার অপেক্ষা করে। খুব সুন্দর দিন ছিল তাঁদের। সেই সময় খবর আসে জনৈক ভদ্রলোক তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। কে তিনি? এথেল বাজি ধরেন মৃত্যুদণ্ড খারিজের আদেশ নিয়ে ব্লক আসছে।

যিনি আসেন তাঁর কোনো নাম নেই; তাঁর পরিচয় তিনি আমেরিকার রাজপ্রতিনিধি। তিনি আজ এমন একটা দায়িত্ব পালন করতে এসেছেন যার গুরুত্ব মানবসভ্যতার ইতিহাসে পেনিসিলিন আবিষ্কার বা ভলগা-ডন খাল কাটার থেকে কম নয়। তাঁর মতে রোজেনবার্গরা নিরপরাধ। তাই আজকের দিনটা এথেল, জুলিয়াস আর রাজপ্রতিনিধির জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন হয়ে উঠতে পারে।

"রাজপ্রতিনিধি : শয়তান আবার শুরু করেছে আগুন নিয়ে খেলা। কিন্তু সে জানে না, এ আগুন এবার নিজেকেই পুড়িয়ে মারবে।

জুলিয়াস : আগুন নিয়ে খেলা শুরু হওয়ার আগে শয়তানের হাত থেকে খেলনাগুলো সরিয়ে আনার দায়িত্ব আমাদেরই।"<sup>২</sup>

শয়তানের সেই আগুনের নাম পরমাণু বোমা। আপাতত দুজনেরই উদ্দেশ্য আমেরিকার ষড়যন্ত্র ভেদ করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু তাঁর মূল উদ্দেশ্য আরও জটিল, আরও অপমানজনক। কথার ফাঁদে মন্ত্রমুগ্ধ করে তিনি আদায় করে নিতে চান রোজেনবার্গদের স্বীকৃতি।

দ্বিতীয় অক্ষে তিনি আমেরিকা সরকারের সেই স্বীকৃতিপত্র তুলে ধরেন। যে পত্রে পরিষ্কার লেখা ছিল রোজেনবার্গরা গুপ্তচরবৃত্তির দোষ স্বীকার করলে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড বাতিল করা হবে। রাজপ্রতিনিধির বন্ধুত্বের মুখোশটা খুলে গিয়ে তাঁর সরকারি 'দালাল'-এর চেহারাটা ঝকঝক করে ওঠে। জুলিয়াস স্পষ্টভাষায় জানান,

"সোজা বাইরে চলে যান—গিয়ে প্রধান বিচারপতি, প্রেসিডেন্ট, মহামান্য নেতৃবৃন্দ প্রত্যেককে চিৎকার করে জানিয়ে দিন—রোজেনবার্গ দম্পতি কারও করুণা ভিক্ষা করে না। দুনিয়ায় কোনো শক্তি তাঁদের মানবিক মর্যাদাকে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে পারবে না— ফাঁসির দড়ি কিংবা বিদ্যুৎ চেয়ারের ভয়ও না।"<sup>°</sup>

জুলিয়াসরা জানেন তাঁদের স্বাক্ষর করার অর্থ আমেরিকার বিচারবিভাগের চক্রান্তকে আইনি প্রমাণ করা। সারা বিশ্ববাসী তাঁদের সঙ্গে হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু সবার জীবনে সেই সৌভাগ্য নাও জুটতে পারে।

এথেলদের কাছে পুরো পরিকল্পনা স্পষ্ট হয়ে যায়। মৃত্যুর দু ঘন্টা আগে স্বয়ং বিচারপতি ফোন করে খোঁজ নিচ্ছেন তাঁরা স্বাক্ষর করেছেন কিনা। তাঁরা বুঝতে পারেন আমেরিকা সমগ্র বিশ্বের কাছে নিজেকে রাজনৈতিকভাবে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য সোভিয়েতের বিজ্ঞানকে ছোটো করতে চায়। তারা দেখাতে চায় গুপ্তচরের সাহায্য ছাড়া সোভিয়েতের পক্ষে পরমাণু বোমা তৈরি করা সম্ভব ছিল না। এথেলদের বজ্রকঠিন মানসিকতার কাছে পরাজিত হয়ে ক্ষমতার অলিন্দে থাকা রাজপ্রতিনিধির ভিতরের অমানুষটা বেরিয়ে আসে। তিনি জুলিয়াসকে ভয় দেখানোর জন্য ইলেকট্রিক চেয়ার দেখান।

আর শিশু পুত্রদের প্রসঙ্গ তুলে এথেলকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। শুধু মৃত্যুদণ্ড রদ নয়, চুক্তির নতুন বয়ানে যুক্ত হয় নিঃশর্ত মুক্তি।

তৃতীয় অক্ষে তিনি স্বাক্ষরিত কাগজটি নেওয়ার জন্য ফিরে আসেন। না, রোজেনবার্গরা সই করেননি। মিথ্যাকে তাঁরা জয়যুক্ত হতে দেবেন না। চুক্তিপত্রের কাগজটিকে ছিঁড়ে তাঁরা জানলা দিয়ে হাওয়ায় ভাসিয়ে দেন। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় রাজপ্রতিনিধির। তাঁর আচরণে আমলাতন্ত্রের অন্তরালে থাকা রাষ্ট্রের ফ্যাসিস্ট চেহারাটা বেরিয়ে আসতে থাকে। সব রাষ্ট্রব্যবস্থাই চায় জনতার উপর পূর্ণ দখলদারি। হিটলারের কনসেনস্ট্রেশন ক্যাম্প, স্তালিনের কুলাগ, আইজেনহাওয়ারের সিং সিং কারাগারের ইলেকট্রিক চেয়ার—প্রকৃতিগতভাবে প্রত্যেকেই ফ্যাসিস্ট। রাজপ্রতিনিধি তাদেরই দাবার ঘুঁটি। তাই বিশ্বের সব জায়গায় তাঁদের একরকম দেখতে লাগে, তাঁদের কোনো নাম হয় না। রাজপ্রতিনিধির সংলাপে বেরিয়ে আসে রাষ্ট্রের ফ্যাসিস্ট চেহারাটা.

"ন্যায়, নীতি, বিবেক—এগুলো শয়তানের দর্শন—মানুষকে পঙ্গু করাই যার কাজ—মুক্তি! ওটা একটা বিরাট ধাপ্পা, পশুবলির আগের মন্ত্র। যা কিছু সুন্দর, যা কিছু পবিত্র তাকে অস্বীকার করার নাম মুক্তি! মুক্তি! যা আমাদের জীবনকে অধঃপতিত করছে দিনের পর দিন, যা সমস্ত দুনিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিকে টেনে নামাচ্ছে ধুলোয়, যা কিছু সুন্দর তাকে করছে কলুম্বিত! এ মুক্তি কাপুরুষের আশ্রয়স্থল, নির্বোধের স্বর্গরাজ্য, কলঙ্কিত ব্যভিচারী কুৎসিত সন্তান।"<sup>8</sup>

কিন্তু ১৯৫৩ সালের ২০ জুন রাতে রোজেনবার্গরা আবার জানিয়ে দিলেন নতজানু হয়ে স্বাধীনতা কেনা যায় না। পরাজিত রাজপ্রতিনিধি জেনে যান আরও বড়ো এক লড়াইয়ের জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তাঁরা প্রস্তুত হয়েছিলেন, তবুও মানুষের প্রতিরোধশক্তির কাছে ফের পরাজিত হয়েছিলেন। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ যার প্রমাণ।

রোজেনবার্গদের মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সারা শহরে বিদ্যুৎ চলে যায়, সাময়িকভাবে অকেজো হয়ে যায় ইলেকট্রিক চেয়ার। পিভির মনে হয় এ ঈশ্বরের সংকেত। বিশ্বের মানুষের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে

তিনি হয়তো বিদ্যুৎ নিভিয়ে দিয়েছেন। আলো চলে আসে—পিভিকে আদেশ দেওয়া হয় তাঁদেরকে বিদ্যুৎ চেয়ারের কক্ষে নিয়ে যেতে। পিভি পারে না, শেষ মুহূর্তে তার ছোটো নাতিটির কথা মনে পড়ে, যার বয়স রোজেনবার্গদের ছেলেদের মতো। পিভির চোখে জ্বলজ্বল করতে থাকে কয়েদখানার দেওয়ালে লেখা রোজেনবার্গদের শেষ ইস্তেহার, "রবার্ট ও মাইকেল, ভবিষ্যতের ওপর বিশ্বাস রেখো, তার মাঝেই আমরা বেঁচে থাকব।"

জুলিয়াস বা এথেল অপরাধী কিনা সেই নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, সমগ্র বিশ্ব মুক্তকণ্ঠে তাঁদের প্রেমের শক্তি স্বীকার করেছিল। 'আমেরিকান গুপ্তচর' নয়, তাঁদের পরিচয় হয়েছিল এ যুগের 'রোমিও-জুলিয়েট'। বন্দী অবস্থায় তাঁদের চুম্বনরত ছবি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। নাটকে জুলিয়াস বলেছিল, "সুন্দরকে পাওয়ার জন্যেই আমরা বাঁচতে চেয়েছিলাম—বাঁচতে চেয়েছিলাম—ভালোবাসার জন্যে— তালোবাসা পাওয়ার জন্য"। সেই সুন্দরকে পাওয়ার জন্য তাঁদের সত্যের দারুণ মূল্য দিতে হয়েছিল। তাঁরা হদয়ের সত্যকে অস্বীকার করে জীবনকে বেছে নিতে চাননি। তখন প্রত্যেকদিন ঘরে ফেরার পর একে অপরের দিকে তাকিয়ে নিজেদের বিশ্বাসঘাতক মনে হত। তাঁদের পক্ষে বেইমানকে তালোবাসা সম্ভব ছিল না। রাজপ্রতিনিধি যেন মৃত্যুদূতের মতো তাঁদের প্রেমের শক্তির পরীক্ষা নিতে এসেছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধ, পরমাণু বিক্ষোরণ, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতিবাদ, আইজেনহাওয়ারের চক্রান্ত সব মিথ্যা। সত্যি এটাই যে ঠিক আর একঘন্টা পরে 'গুপ্তচর'-এর তকমা নিয়ে তাঁদের বিদ্যুৎ চেয়ারে বসতে হবে। তার আগে তাঁরা অচেনা শক্রে কাছে তাঁদের প্রেমের গল্প বলে যেতে চান.

"জুলিয়াস : যখন তার হাতদুটোতে হাতকড়া পরিয়ে দিলে—তখন সে যেন স্পর্শ পাচ্ছিল কার আলিঙ্গনের। যখন তার জেরা চলছিল পুলিশের সামনে উত্যক্ত, উত্তপ্ত কপালে সে যেন অনুভব করছিল কার শীতল অঙ্গুলির পরশ; অফিসার চিৎকার করে উঠল— 'বিশ্বাসঘাতক'। ঠিক সেই মুহূর্তে কানের কাছে কার যেন মিষ্টি সুর বেজে উঠল—আমি তোমায় ভালোবাসি। তার সমস্ত লুট হয়ে গেল, সে দেউলে—তবু সে ধনী, আগের চেয়ে অনেক ধনী। এমনি করেই ভালোবাসা তাকে মুক্তি দিয়েছিল বন্দী দশাতেও।

এথেল : আমি তাকে ভালোবাসি। কিন্তু ভুলেও মনে করবেন না, যে ভালোবাসা একটা আদর্শ স্থানীয় আনুগত্যের অর্ঘ্য মাত্র। না, পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর পুরুষ যদি বিচারকের আসনে বসে মিথ্যা রায় দেয়, আমি তাকে ঘৃণা করি। আর একজন কুৎসিত কদর্য মানুষ যদি জীবনের সত্যকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চায়—সে আমার অন্তরতম—পৃথিবীর সুন্দরতম পুরুষ।"<sup>৫</sup>

নাটককার তাঁদের জোর করে কমিউনিস্ট প্রমাণ করতে চাননি। তাঁরা শুধুই প্রেমিক—যে প্রেম মানুষকে দেউলে করে, যে প্রেম পাষাণের বুক চিঁড়ে গোলাপের পাঁপড়িকে ফুটিয়ে তোলে। পরমাণু শক্তি নিয়ে খেলা করা রাষ্ট্রব্যবস্থা তালোবাসার বিরাট শক্তিকে বুঝতে পারে না, তাই সে ভয় পায়। সে সবটা বুঝতে চায়; যা বুঝতে পারে না তাকে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু সে জানে না যে তালোবাসার স্বভাব নিজেকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া, বিদ্যুৎ চেয়ারের প্রবাহ তার কিছু করতে পারবে না। আমেরিকা বা জার্মানি কিংবা সোভিয়েত রাশিয়া—স্বৈরাচারী রাষ্ট্রকে পৃথিবীর সব থেকে মহৎ আদর্শ ভালোবাসার কাছে বারবার হার মানতে হয়েছে।

# বর্ণবিদ্বেষী সমস্যার নাটক 'মৃত্যুহীন' :

কৃষ্ণাঙ্গদের উপর অত্যাচারের ইতিহাস মানবসভ্যতার অন্যতম কলঙ্কজনক অধ্যায়। যেদিন ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীরা সমগ্র বিশ্বে উপনিবেশ তৈরি করার জন্য নৌবহর নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কৃষ্ণাঙ্গরা শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার। আধুনিক সময়েও পৃথিবীর অন্যতম উন্নত ও বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবৈষম্যের ইতিহাস সবথেকে জঘন্যতম। আইন প্রচলন, সংবিধান পরিবর্তন, সরকারি নিয়মের ঘোষিত নীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আজও একশ্রেণির মানুষের মনে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি ঘৃণা জমে রয়েছে। সম্প্রতি আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্তৃক কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড় জর্জ ফ্লয়েডের মর্মান্তিক হত্যা বর্ণবৈষম্যের প্রশ্নটিকে আবার জাগিয়ে

তুলেছে। যার প্রতিবাদে আমেরিকায় তো বটেই, সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার'-এর বক্তব্যকে তুলে ধরেছিল।

১৯৬৫ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ চিররঞ্জন দাসের 'মৃত্যুহীন' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। নাটকটিতে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদ, কৃষ্ণাঙ্গদের উপর অত্যাচারের ঘটনাকে তুলে ধরে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। নাটকটিতে তৎকালীন আমেরিকার 'সিভিল রাইটস মুভমেন্ট'-এর সমসাময়িক ঘটনাকে তুলে ধরা হয়েছে।

নাটকে আমেরিকার কোনো এক শহরে মিঃ লুইস ও তাঁর স্ত্রী ক্যাথরিন তীব্র মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে ঘরবন্দী হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। বাইরে বেরোলেই শোনা যায় শ্বেতাঙ্গ বর্ণবৈষম্যকারীদের ক্ষুধার্ত হিংস্র চিৎকার। রাত বাড়লেই তারা কৃষ্ণ্ণঙ্গ পল্লীগুলিতে আক্রমণ চালায়। আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়িয়ে দেয় তাদের বসতবাড়ি, আগুনের মুখে ছুঁড়ে দেয় ছোটো ছোটো কৃষ্ণাঙ্গ শিশুদের, নৃশংসভাবে হত্যা করে পুরুষদের, ধর্ষণ করে মহিলাদের। এইভাবে তারা নির্মাণ করবে 'পবিত্র আমেরিকা'। কৃষ্ণাঙ্গরা আজ সমানাধিকারের দাবি জানানোয় শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদের অস্মিতা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। বর্ণবিদ্বেষী মিঃ জোন্সের মতে,

"ঐ হতকুচ্ছিত নাক থ্যাবড়া জন্তুগুলো সদর্পে আমাদের পাশে পূর্ণ মানুষের অধিকার নিয়ে দাঁড়াবে, আমাদের ঐতিহ্য সভ্যতার সমান ভাগীদার হবে, এ অসহ্য।... আমি কেন, আমেরিকার প্রতিটি মানুষকে জিজ্ঞেস কর সবাই এককণ্ঠে বলবে—ঐ আলকাতরার রঙের

ঠোঁট মোটা জীবগুলোকে বুনো শুয়োরের থেকে এক চুলও আলাদা ভাবা যায় না।"\*

সংবাদপত্রগুলি তাদের উৎসাহ দেয়; আদালতের বিচারকদের অধিকাংশই কৃষ্ণাঙ্গ-বিরোধী হওয়ায় এদের কোনো শান্তি হয় না। যাদের হাতে আইন তারা হয় নির্বাক কিংবা তারাই চুপিসারে এই বর্ণবিদ্বেষের খেলার নিয়ম নির্ধারণ করছে। শহরের একপ্রান্তে যখন কৃষ্ণাঙ্গ পল্লী পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, তখন শহরের অন্যপ্রান্তে আমেরিকার সেনেটরের সভায় তার উদযাপন চলছে।

মিঃ লুইস এই ধরণের কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করায় তিনি আজ জাতিশক্র। তিনি বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে খবরের কাগজে লিখেছেন, কৃষ্ণ্ণঙ্গদের মিছিলেও গেছেন। তাঁর আরেকটা পরিচয় তিনি আদর্শগতভাবে কমিউনিস্ট। তখনও আমেরিকায় কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী কাজকর্মের বিরুদ্ধে মানুষের জাগরণের প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে এদেশের কৃষ্ণাঙ্গদের উপর। তিনি ঠিক করেন কৃষ্ণাঙ্গ যুবক পিটারের সঙ্গে গোপনে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলবার কাজ শুরু করবেন।

সেই সময়ে পিটার ভগ্নদূতের মতো এসে উপস্থিত হয়। বর্ণবিদ্বেষীরা পিটারের বন্তি পুড়িয়ে দিয়েছে, শিশু-বৃদ্ধ-মহিলাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারছে। পুলিশ কর্তাদের উপস্থিতিতে পিটারের স্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে। ভয়ে পিটার কোনো নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পালাচ্ছে। বিপদ জেনেও লুইস তাকে নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রাখে। পিটারকে তাড়া করে লুইসের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় ভিক্টর, গ্রেগরি, হাডসন, রোবসন ও আরও অনেকে। পিটারকে খুঁজে না পেয়ে তাদের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ে মিঃ লুইসের উপর। তাদের কথাবার্তায় তীব্র বর্ণবিদ্বেষ চুইয়ে পড়ে। তারা লুইসকে কৃষ্ণাঙ্গদের সমর্থন করার জন্য অপমান করে।

"ভিক্টর : আপনি আমাদের সঙ্গে নিগার লিঞ্চিং-এ বেরোননি কেন?

লুইস : আমি ওসব পছন্দ করি না, সমর্থন করি না!

রোবসন : হোয়াট!

গ্রেগরি : কম্যুনিস্ট! ফিদেল কাস্ত্রোর দালাল।

ভিক্টর : অর্থাৎ আপনি নিগারদের সমর্থন করেন। ঐ কুকুরগুলো আমাদের সাথে পাশাপাশি বসে পড়াশোনা করবে, এক রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া করবে, শ্বেতাঙ্গ মেয়েদের সাথে নাচবে—এ আপনি সমর্থন করেন?

লুইস : হ্যাঁ করি।"<sup>৭</sup>

কোনোভাবেই লুইসকে নিরস্ত করতে না পেরে তাঁকে মারা শুরু হয়। আহত অবস্থাতেও লুইস চিৎকার করে জানান যে যারা পৃথিবীকে ভালোবাসে তারা একদিন প্রতিবাদ করবে। আঘাতে আঘাতে নির্জীব হয়ে আসে লুইসের শরীর। ঈশ্বর ও 'পবিত্র আমেরিকা'র জয়ধ্বনি দিতে দিতে বর্ণবিদ্বেষীরাও চলে যায় পিটারের সন্ধানে। নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের গ্লানি তাদের চোখে ধরা পড়ে না, বরং মদ্যপ কণ্ঠে শোনা যায় কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের নিয়ে ঘৃণ্য পরিকল্পনা।

তারা চলে গেলে ক্যাথরিন বেরিয়ে আসে, তার শরীরের উপর দিয়েও একটা ঝড় বয়ে গেছে। গোপন কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে পিটার মিঃ লুইসের অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে। যেভাবে একদিন আমেরিকার শ্রমিকরা হে মার্কেটে রক্ত-পতাকা তুলে ধরে বিশ্বের সমস্ত শ্রমিকদের লড়াইয়ের পথনির্দেশ করে গেছে, সেভাবেই আজকের কৃষ্ণাঙ্গদের সমানাধিকারের দাবি একদিন বিশ্বের সকল মানুষের সাম্যবাদকে বয়ে আনবে। লুইস দৃঢ়কণ্ঠে নতুন সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন বর্ণনা করতে করতে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েন। চিররঞ্জন দাস বর্ণবিদ্বেষের মতো জ্বলন্ত আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে নাটক রচনা করে গণনাট্য সংঘের বিশ্বমানবতার আদর্শের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি নাটকটিতে এমন একটি বিষয়কে তুলে এনেছেন, যে বিষয়ে বাংলা নাটকে খুব বেশি আলোকপাত করা হয়নি। কিন্তু বামপন্থী শ্রেণিচেতনা প্রবাহিত করতে গিয়ে তিনি মূল বিষয় থেকে সরে এসেছেন। মিঃ লুইস বর্ণবিদ্বেষী জোন্সকে বলেছিলেন,

"তুমিও মজুর, আমিও মজুর আর তোমরা যাদের ঘৃণা কর সেই নিগ্রোরাও আমাদের মতো গায়ের রক্ত জল করে নানা সমস্যা নিয়ে বাঁচে। এখানে বর্ণের প্রশ্ন নিয়ে এসে বিভেদ সৃষ্টি করা, আর নিজেদের পায়ে কুডুল মারা একই ব্যাপার।"<sup>৮</sup>

এখানে নাটককার কয়েকশো বছরের অত্যাচার-বঞ্চনার ইতিহাসকে বর্ণগত বা জাতিগত রূপে না দেখে শ্রেণিগত ভাবে দেখায় সমস্যাটির অতিসরলীকরণ করা হয়েছে। মার্টিন লুথার কিং-এর বক্তব্যে যে সমানাধিকারের প্রসঙ্গ এসেছে, তাও একান্তভাবেই জাতিগত ছিল। বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে বামপন্থীরা প্রতিবাদী ছিল ঠিকই, কিন্তু বামপন্থী শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে সমাধানের পথ খোঁজা হয়নি। বরং

তৎকালীন আমেরিকার পরিস্থিতিতে খুব যুক্তিসঙ্গতভাবেই কৃষ্ণ্ণঙ্গ অধিকারের আন্দোলনকারীরা বামপন্থী তকমা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছিল। একুশ শতকে দাঁড়িয়ে নাটকটির আরেকটি দুর্বলতা চোখে পড়তে পারে। নাটকে কৃষ্ণ্ণঙ্গ বোঝাতে 'নিগ্রো' শব্দটিকেই ব্যবহার করা হয়েছে, তুলনায় 'নিগার' শব্দটিকে গালাগালি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্ণবিদ্বেষীরা বারবার 'নিগার' শব্দটি ব্যবহার করায় লুইস বলেছিলেন, "নিগার শব্দটি গালাগাল, নিগ্রো বলুন"। অথচ আজকের দিনে 'নিগো' শব্দটিকেও অপমানজনক রূপে ধরা হয়। বিশেষ করে ২০১৩ সালে 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলনের সূত্রপাত থেকে। এটিকে নাটকের দুর্বলতা না ধরে ইতিহাসের দুর্বলতা ধরাটাই শ্রেয়।

নাটকটি প্রযোজিত হয়েছিল ১৯৬৫ সালে, যখন 'সিভিল রাইটস আন্দোলন' মধ্যগগনে। কিন্তু আজও অনেকে মনে করেন রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্দরেই বর্ণবৈষম্যের বীজ লুকিয়ে রয়েছে। জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যু সেই প্রশ্ন আবার উসকে দিয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে ভরসা জুগিয়েছে 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার'-এর দাবিতে আমেরিকাসহ সমগ্র বিশ্বের সচেতন মানুষের প্রতিবাদী চেতনা। আজও বিশ্বের সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বর্ণবিদ্বেষী সমস্যার বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে।

# 'ভিয়েতনাম'—বিপ্লবের নাটক :

আজকের দিনের ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়া তিনটি পৃথক দেশ উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে একত্রে ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল। ১৯৩০ সালে ভিয়েতনামিজ কমিউনিস্ট পার্টি তৈরির পর থেকে মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার আকাজ্জা তীব্র হতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রশক্তির সাহায্য ও হো চি মিনের নেতৃত্বে ১৯৪৫ সালের ১৭ আগস্ট ভিয়েতনামে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। কিন্তু ভিয়েতনাম দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবাধীন এলাকা উত্তর ভিয়েতনাম এবং ফ্রাঙ্গ-আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভাবাধীন দক্ষিণ ভিয়েতনাম রূপে পরিচিত হয়। দীর্ঘ নয় বছর লড়াইয়ের পর ১৯৫৫-তে ফ্রান্সের অধীনতা থেকে উত্তর ভিয়েতনাম মুক্ত হলেও '১৭ তম সমান্তরাল' রেখাদ্বারা দুটি রাষ্ট্রের বিভাজন বর্তমান থাকে। হো-চি-মিনের নেতৃত্বে উত্তর ভিয়েতনামে ভিয়েত-মিন

সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামে ফ্রান্স সমর্থিত সায়গন সরকারের প্রধান ছিলেন কমিউনিস্ট বিদ্বেষী ও রক্ষণশীল ক্যাথলিক নো দিন দিয়েম (Ngo Dinh Diem)। ১৯৫৪-র জেনেভা সম্মেলনে জানানো হয় দু-বছর পর গণভোটের মাধ্যমে ভিয়েতনামের সংযুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।<sup>৯</sup>

চিনের সীমান্তে অবস্থিত উত্তর ভিয়েতনামে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পুঁজিবাদী আমেরিকার মাথাব্যথার বিষয় হয়ে উঠল। কারণ ভিয়েতনাম হল সেই বিশেষ আন্তর্জাতিক দরজা, যেখান থেকে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে দখলে রাখা যায়। ছয়ের দশকের শুরু থেকেই আমেরিকা যুক্তরান্ট্রের রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি দক্ষিণ ভিয়েতনামে সৈন্য সমাবেশ ঘটাচ্ছিলেন। খাতায়-কলমে যাদের উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামের গণতন্ত্র রক্ষা, কিন্তু আদতে উত্তর ভিয়েতনাম দখল করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। ১৯৬৩ সালে নো দিন দিয়েমের গুপ্তহত্যার পর যুদ্ধ প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আমেরিকার তরফ থেকে শুধু প্ররোচনার প্রয়োজন ছিল। ১৯৬৪-র আগস্টে টনকিং খাঁড়িতে মার্কিন জাহাজে বোমানিক্ষেপ করা হয়। আমেরিকা উত্তর ভিয়েতনামকে দোষারোপ করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে।

একদিকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সৈন্যদল (ARVN), মার্কিন সৈন্য ও অন্যান্য অকমিউনিস্ট দেশগুলির সৈন্য এগিয়ে আসে। অন্যদিকে উত্তর ভিয়েতনামের গেরিলা জনসেনা (PAVN) ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে অবস্থিত কমিউনিস্ট মুক্তিযোদ্ধা ভিয়েত-কংকে সমর্থন করে চিন, রাশিয়া, উত্তর কোরিয়ার মতো দেশগুলি। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে দক্ষিণ ভিয়েতনামের দা নাং (Da Nang) অঞ্চলে মার্কিন সৈন্য যুদ্ধ শুরু করে। যার ব্যাপ্তি ছিল ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত। তার মধ্যে আমেরিকায় তিনবার রাষ্ট্রপতি পরিবর্তন হলেও যুদ্ধনীতির কোনো পরিবর্তন হয়নি।

ভিয়েতনামের অরণ্যবিস্তৃত স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় মার্কিন সৈন্যদের প্রচলিত যুদ্ধপদ্ধতি কাজ করেনি। ভিয়েত-কং সৈন্যরা জঙ্গলের মধ্যে থেকে আচমকা আক্রমণে মার্কিন সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করে দিত। শক্ত মাটির তলায় সুড়ঙ্গের জাল বিস্তার করে তারা প্রায় সমস্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভিয়েতনামের সাধারণ মানুষও তাদের ব্যাপক সমর্থন করেছিল। ক্রমাগত ব্যর্থতা, হতাশায়

মার্কিন সৈন্য সাধারণ ভিয়েতনামিদের উপর পাশবিক অত্যাচার শুরু করে। গ্রামকে-গ্রাম তারা আগুন জ্বালিয়ে দিত, পুরুষ-নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে নৃশংসভাবে গণহত্যা করত। গণধর্ষণ হয়ে গিয়েছিল তাদের বিনোদনের বিষয়। নাপাম বোমার তেজস্ক্রিয়তায় মুহূর্তের মধ্যে অরণ্যভূমি পুড়ে ছারখার হয়ে যেত।<sup>33</sup>

চিররঞ্জন দাস রচিত 'ভিয়েতনাম' নাটকটি গণনাট্য সংঘ কর্তৃক ১৯৬৫ সালের ১৪ জুলাই প্রথম প্রযোজিত হয়। অর্থাৎ ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন সৈন্যের অত্যাচার তখনও তীব্র আকার ধারণ করেনি। কিন্তু পুনরায় পরাধীন হওয়ার আশঙ্কায় ভিয়েতনামি মানুষ প্রতিরোধের বর্ম পড়ে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। নাটকের পটভূমি দক্ষিণ ভিয়েতনামের মেকং নদীর তীরে ফুক-ভিনে অঞ্চলের মার্কিন সেনা ছাউনি। রাজনৈতিক উপদেষ্টা মিঃ ডোনাল্ড ও মিঃ রবিনসন চিন্তিত; কারণ পাহাড়ের পশ্চিমদিকে মেকং নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় ভিয়েতনাম মুক্তিবাহিনীর গুপ্ত আক্রমণে বহু মার্কিন সৈন্য মারা গেছে। রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে তারা আক্রমণ করে। কে বন্ধু আর কে শক্রু চেনার আগেই ঝড়ের নিমেষে তারা মার্কিন সৈন্যদের নিশ্চিহ্ণ করে পুনরায় লুকিয়ে পড়ে। তারা যদি মেকং নদীর সেতু একবার ধ্বংস করে দিতে পারে, তাহলে সমগ্র ফুক-ভিনে তাদের দখলে চলে আসবে। মার্কিন সৈন্যরা নাপাম বোমায় বহু গ্রাম ধ্বংস করে দিয়েছে, সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে। তবুও তাদের মুখ থেকে ভিয়েত-কংদের সম্পর্কে নতুন কোনো তথ্য আবিষ্কার করতে পারেনি। সামরিক অফিসার মেজর হেনরি ব্রিগস বলে,

"সমস্ত দক্ষিণ ভিয়েতনাম জুড়ে তাদের বাহিনী ছড়িয়ে আছে। বলতে গেলে প্রতিটি মানুষই তার সদস্য বা সমর্থক। একটা দুর্ভেদ্য জালের ফাঁদে পড়ে আমরা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছি। জলে জঙ্গলে; পাহাড়ে গেরিলা যুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে কঠিন লড়াইয়ের কায়দা আমাদের সেনারা কিছুই জানে না, এখানকার সব পরিস্থিতিই আমাদের বিপক্ষে।"<sup>১২</sup>

আমেরিকার সেনা উর্দি গায়ে ব্রিগস যেটা বলতে পারেনি সেটা হল ভিয়েতনামের প্রতিটি মানুষের সঙ্গেই মুক্তিবাহিনীর আত্মার যোগ। প্রতিটি মানুষই এখানে মুক্তির নেশায় চঞ্চল। প্রতিটি

ধানের আঁটি এখানে বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র। ব্রিগসকে নির্দেশ দেওয়া হয় ফুক-ভিনের সমস্ত খবর সরাসরি সায়গনের আমেরিকা দূতাবাসে জানাতে। স্পষ্ট বোঝা যায়, ভিয়েতনামের যুদ্ধে শুধু আমেরিকার সৈন্যবাহিনী যুক্ত নয়, বিদেশমন্ত্রক তথা সরাসরি রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত যুক্ত। আমেরিকার কাছে ভিয়েতনাম শুধু 'গণতন্ত্র' রক্ষার লড়াই ছিল না, তাদের সাম্রাজ্যবাদী আক্ষালন ও পুঁজিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা প্রতিরোধকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার যুদ্ধ ছিল। মিঃ রবিনসনের কথায় তাদের সমস্ত পরিকল্পনা পরিষ্কার হয়ে যায়,

"এখানকার মাটির বুকে, আমাদের সযত্ন রোপিত শিকড় সমূলে উচ্ছেদ করতে চায় ঐ ভয়ঙ্কর দস্যুরা। অ্যাফ্রো-এশিয়া থেকে ক্রমশ আমাদের প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ হয়ে চলেছে। আজ ভিয়েতনাম যদি স্বাধীন হয়, আমাদের দেশের রকফেলাররা কোটি কোটি ডলার মুনাফা হারাবে। এই বিষাক্ত অস্ত্র ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত পৃথিবীর দেশে দেশে।"<sup>30</sup>

সেই সময়ে মেকং নদীতে একটি তরকারি বোঝাই নৌকা ধরা পড়ে। যার মধ্যে লুকনো ছিল ডিনামাইট। বাকিরা পালিয়ে গেলেও নগুয়েন থোরি নামের এক মাঝিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার থেকে পাওয়া যায় এক প্যাকেট ভিজে সিগারেট, খুচরো পয়সা, রুমাল, বাঁদরের মতো করে আঁকা আমেরিকান রাষ্ট্রপতি জনসনের মুখ ও একতারা প্যামফ্লেট। তাকে জেরা করেও কোনো গুপ্ত তথ্য উদ্ধার করা যায় না। প্রতিটা আঘাতের উত্তরে সে জানায়,

"আমরা বৈদেশিক শাসন-শোষণ চূর্ণ করে স্বাধীন হতে চাই, মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি ফিরিয়ে আনতে চাই, আর সেই শপথে যদি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলো আমাদের অভিনন্দন জানায় সেটা আমাদের গৌরব।"<sup>38</sup>

মার্কিন সেনাদের গণতন্ত্রের বুলি নগুয়েনের মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়ে তোলে। যারা অন্য জাতির গলার উপর পা তুলে বসে থাকে তাদের মুখে গণতন্ত্রের কথা মানায় না। ভিয়েত-কং সন্দেহে তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হলেও সে ভয়হীন। স্ত্রী-সন্তানের ভবিষ্যতের সে পরোয়া করে না, কারণ দেশের

ভবিষ্যতের কাছে ব্যক্তিস্বার্থ তুচ্ছ বিষয়। তারা কাপুরুষতাকে ঘৃণা করে। বীরের মতো বিদেশি শত্রুকে নিধন করাই তাদের জীবনের একমাত্র সংকল্প।

নগুয়েনের কাছে পাওয়া প্যামফ্লেটে সারা বিশ্বের মানুষের খবর পাওয়া যায়। যেখানে আমেরিকার সৈন্যসমাবেশকে 'বর্বর, পাশবিক' সম্বোধন করে বিনা শর্তে এদেশের মাটি ছেড়ে যাওয়ার দাবি করা হয়েছে। খোদ আমেরিকাতে সাধারণ মানুষ হোয়াইট হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহ করছে। তারা যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়। নগুয়েনের প্যামফ্লেটের বক্তব্যে কোনো অতিরেক ছিল না। বান্তবে আমেরিকার প্রতিরক্ষা প্রধান ম্যাকনামারার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে শান্তিকামী মানুষ প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল। শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, শিল্পী, এমনকি যুদ্ধফেরত সৈন্যরাও শান্তির মিছিলে পা মিলিয়েছিল। আমেরিকার সৈন্যদের পরিবার ঘরের ছেলেদের ঘরে ফিরে আসার আবেদন জানিয়েছিল। সমগ্র দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ভিয়েতনামের জঙ্গলে অবস্থিত সৈন্যদের মধ্যে এই বার্তা যে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী নগুয়েন প্যামফ্লেটসহ ধরা দিয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামের সৈন্যদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জানিয়ে তোলা এবং মার্কিন সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধের 'মহৎ' উদ্দেশ্য সম্পর্কে গ্লানিবোধ জাগিয়ে তোলা। হাতে রক্তের দাগ নিয়ে যারা ইতিমধ্যেই সংশয়ে ভুগছিল।

লেফটেন্যান্ট রিচার্ড স্টেইন সেরকমই একজন সৈন্য। বীর, সাহসী, বুদ্ধিমান এই যোদ্ধার মনে আজ সংশয় জেগেছে। রিচার্ড আর যুদ্ধ চায় না, দেশে ফিরতে চায়। ভিয়েতনাম থেকে সহস্র মাইল দূরে সেখানে তার জন্য মা, স্ত্রী, সন্তান এক অজানা আশঙ্কায় চোখের জল ফেলছে। বন্ধু-সহকর্মীদের মৃত্যু আর নিরপরাধ দেশপ্রেমীদের হত্যার অপরাধ তাকে ক্রমাগত অবসাদগ্রস্ত করে তুলেছে। কোরিয়ার যুদ্ধে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করা এই যোদ্ধা আজ সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। সেনার অধিকার ভুলে সে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ে,

"রিচার্ড : সংশয় আমাদের মধ্যে প্রচুর আছে। এবং যে কোনো সৈনিকের পক্ষে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংশয়ের তরঙ্গে দোলা রীতিমতো বিপজ্জনক। আমরা এখনও জানি না

আটলান্টিক পার হয়ে কেন আমরা এখানে এসেছি? কেন অবিরাম দিনরাত জলে, জঙ্গলে যুদ্ধ করে চলেছি?

ব্রিগস : রিচার্ড, সৈনিকের একমাত্র কাজ নির্দ্বিধায় যুদ্ধ করা।

রিচার্ড : ওটা কোনো যুক্তি নয় স্যার। মিঃ রবিনসন, আই অ্যাম সরি, আমি কি জবাব পাব, কেন আমরা এখানে অবিরাম যুদ্ধ করে চলেছি?

রবিনসন : নিশ্চয়। পৃথিবীতে গণতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে, শান্তি বজায় রাখতে।

রিচার্ড : চমৎকার! কিন্তু সে শান্তি বা গণতন্ত্রে আমাদের মতো নগণ্য সাধারণ মানুষের কি লাভ হবে বলতে পারেন?"<sup>১৫</sup>

রিচার্ড এখানে শুধু আমেরিকার ভিয়েতনাম আক্রমণের সারবত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। প্রশ্ন তুলেছে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী নীতি নিয়ে, প্রশ্ন তুলেছে বিশ্বের লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতাকামী মানুষের হয়ে। একসময় সেনাবাহিনীতে যোগদান করা তার কাছে ছিল পরম গর্বের বিষয়, কিন্তু এখন তা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি চাকরি। সৈনিকের বিবেক থাকতে নেই এ-কথা সে বিশ্বাস করে না। সেনার পোশাক গায়ে দিয়েও সে এখন ভিয়েতনামের জনগণের মহান উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে। স্বাভাবিকভাবেই 'পঞ্চম বাহিনী'র লোক সন্দেহ করে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। মৃত্যুর আগে সে মার্কিন সেনাদের হাত থেকে নগুয়েনকে বাঁচিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত ভিয়েতনামি মুক্তিযোদ্ধারা সমস্ত ফুকভিনে অঞ্চল দখল করে নেয়।

রিচার্ডের মতো হাজারো হাজারো সৈনিক পরবর্তীকালে মানসিক অবসাদে আক্রান্ত হয়েছিল। ইতিহাসে যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ভিয়েতনাম সিনড্রোম'।<sup>১৬</sup> যুদ্ধের ভয়াবহতা, নিজের কৃতকর্মের দায়, ভিয়েতনামি মানুষের রক্তের দাগ তাদের দুঃস্বপ্নে হানা দিয়েছিল। রিচার্ডকে সেই মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়নি। কারণ তার আগেই তাকে কোর্ট-মার্শাল করা হয়। মৃত্যুর আগে সে বলে যায়,

"একটা কথা বলো পৃথিবীর মানুষকে, তোমার দেশের বিপ্লবী ভাইদের—রিচার্ড স্টাইনকে সৈনিক হিসাবে নয়, আমেরিকার একজন সাধারণ মেহনতি মানুষ হিসাবে অন্তর দিয়ে চেয়েছে ভিয়েতনামের মুক্তি। সাম্রাজ্যবাদী অক্টোপাশের বন্ধন থেকে মুক্তি সংগ্রামে নিরত লক্ষ লক্ষ ভিয়েতনামি ভাইদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সে সামিল হতে চেয়েছিল। মেকং নদীর দুই তীরে উদ্বেলিত তরঙ্গের মতো শোষণের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার জন্য তোমরা যে মহান লড়াই করছ, তা তোমাদের সফল হোক বন্ধু।"<sup>১৭</sup>

রিচার্ডের ভবিষ্যৎবাণী সত্যি হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের ৩০ এপ্রিল উত্তর ভিয়েতনামের সৈন্যদল দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সায়গন দখল করে নেয়। ২০ বছরের বিভেদ মুছে ভিয়েতনাম একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তার আগে ১৯৬৮ সালে মি লাই হত্যাযজ্ঞের (My Lai Massacre) নারকীয় ছবি বিশ্ববাসীর সম্মুখে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকাসহ সমস্ত বিশ্ববাসী ধিক্কার জানানো শুরু করে।<sup>১৮</sup> যে যুদ্ধ ছিল আমেরিকা বনাম উত্তর ভিয়েতনামের, সেই যুদ্ধ পরিণত হল সাম্রাজ্যবাদ বনাম বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের লড়াইয়ে। যে যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ শুধুমাত্র ফুক-ভিনে বা কুচি জেলার জঙ্গলে হারেনি, হেরেছিল ওয়াশিংটন ডিসি শহরে, হেরেছিল কলকাতায়।

চিররঞ্জন দাস 'ভিয়েতনাম' নাটকের সঙ্গে পূর্বে আলোচিত নাটককারের 'মৃত্যুহীন' নাটকের প্লটগত সাযুজ্য পাওয়া যায়। দুটি নাটকেই কমিউনিস্ট-বিরোধী আমেরিকার রাষ্ট্রব্যবস্থার দুর্বলতার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে একজন কমিউনিস্ট মানুষ প্রতিবাদ করেন। কৃষ্ণ্ণঙ্গ বা ভিয়েতনামিদের সঙ্গ দিয়ে তিনি রাষ্ট্র বা জাতির প্রতি 'বেইমানি' করেন। মৃত্যুর আগে তিনি বিশ্বমানবতার আদর্শ সমাজের কাছে ছড়িয়ে দিয়ে যান। ছকে বাঁধা কাঠামোয় তৈরি হওয়ায় নাটককারকে নাট্যদ্বন্দ্বের বাহ্যিক ঘটনার উপর নির্ভর করতে হয়। যদিও এই নাটকগুলিতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার বর্বর যুদ্ধনীতির মুখোশ উন্মোচন করে মানুষের প্রতিরোধী শক্তিকে জয়ী করা। সেই উদ্দেশ্যে তিনি সফল হয়েছিলেন।

#### তথ্যসূত্র :

- > POPE MADE APPEAL TO AID ROSENBERGS; PLEA ONE OF MERCY, <u>https://www.nytimes.com/1953/02/14/archives/pope-made-appeal-to-aid-rosenbergs-plea-one-of-mercy-but-neither.html</u>
- ২। বীরু মুখোপাধ্যায়; বিশে জুন, শারদীয়া স্বাধীনতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ- ৭১
- ৩। তদেব, পৃ- ৭৩
- ৪। তদেব, পৃ- ৮৭
- ৫। প্রাগুক্ত, বিশে জুন, পৃ- ৬৯
- ৬। চিররঞ্জন দাস; মৃত্যুহীন, গণনাট্য, ডিসেম্বর, ১৯৮৯, পৃ- ১১৪
- ৭। তদেব, পৃ- ১২০
- ৮। তদেব, পৃ- ১১৪
- ৯। বাবলু ভট্টাচার্য; ভিয়েতনাম বিপ্লব, অগ্রদূত অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১১, ঢাকা, পৃ- ৮৫
- **So** | McNamara asks Giap: What happened in Tonkin Gulf?

https://web.archive.org/web/20150306124920/http://vi.uh.edu/pages/buzz

mat/world198\_4.html

- ১১। প্রাগুক্ত, ভিয়েতনাম বিপ্লব, পৃ- ৯০।
- ১২। চিররঞ্জন দাস; ভিয়েতনাম, গণনাটক, পিপলস থিয়েটার পাবলিকেশন, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, পৃ- ৮২
- ১৩। তদেব, পৃ- ৮৩
- ১৪। তদেব, পৃ- ৮৯
- ১৫। তদেব, পৃ- ৯১
- ۱ https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam\_Syndrome
- ১৭। প্রাগুক্ত, ভিয়েতনাম, গণনাটক, পৃ- ৯৭
- ٥b ا https://en.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B9\_Lai\_massacre
পঞ্চম পরিচ্ছেদ

# গণনাট্য সংঘের নাটকে অন্যান্য প্রসঙ্গ

এই পরিচ্ছেদে আমরা গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত 'রাহুমুক্ত' (প্রযোজনা ১৯৫৪ খ্রি) এবং 'সংক্রান্তি' (প্রযোজনা ১৯৫৭ খ্রি) নাটক দুটি আলোচনা করব। দুটি নাটকেরই রচয়িতা বীরু মুখোপাধ্যায়। 'রাহুমুক্ত' নাটকে বিশ্বরাজনীতির গোলযোগের পরিস্থিতিতে শান্তির বাণীর জয়যাত্রা প্রচারিত হয়েছে। 'সংক্রান্তি' নাটকে উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে বাংলার সমাজবদলের রূপরেখা বামপন্থী দৃষ্টিকোণে তুলে ধরা হয়েছে।

### 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই'—যাত্রানাটক 'রাহুমুক্রু' :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি বিশ্বরাজনীতির গতিপথ আমূল বদলে দিয়েছিল। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, জার্মানি, ইতালির মতো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির হিংস্র চেহারা সারা বিশ্বের মানুষের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায়। ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের ভয়ংকরতা মানুষকে স্তম্ভিত করে দেয়। এরপর শুরু হয় আমেরিকা ও রাশিয়ার 'ঠাণ্ডা লড়াই'। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা রোধ করার জন্য যুদ্ধবিরোধী অবস্থান জোরদার করতে থাকে। ১৯৪৯ সালের এপ্রিলে প্যারিসে ও প্রাগে বিশ্বশান্তি মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বিভিন্ন দেশের বামপন্থী গণসংগঠনগুলি ছাড়াও বিশ্বের হাজারো শান্তিকামী মানুষ জড়ো হয়ে স্পষ্ট যুদ্ধবিরোধী

বার্তা দিয়েছিল। আগস্ট মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ, সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ব্যবস্থাপনায় শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।<sup>3</sup>

১৯৫৪ সালে গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'রাহুমুক্ত' নাটকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অস্থির বিশ্বরাজনীতিতে 'যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই'-এর বাণী রূপকের মাধ্যমে উঠে এসেছে। নাটককার শুধু বিশ্বশান্তির আশা ব্যক্ত করে কাজ সমাপ্ত করেননি, বরং বামপন্থী শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের অপসারণের পর্থটিও স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন। তবে খুব স্বাভাবিকভাবেই নাটকে রূপকের সাহায্যে আমেরিকাসহ পুঁজিবাদ আশ্রিত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকেই মূল শত্রু করে দেখানো হয়েছে। নাটকটির 'কৈফিয়ৎ' অংশে নাটককার জানিয়েছেন,

"আপাত রাজনৈতিক বক্তব্যের পিছনে একটি রূপকের স্থান রাহুমুক্তে আছে। সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক রাজা, দেশের শ্রী সম্পদের প্রতীক অরুন্ধতীকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু লুষ্ঠিত সম্পদের অধিকারী হয়েও পায় না সাড়া মনের, সে মন তার জনসাধারণের প্রতিভূর কাছে উৎসর্গীকৃত। পদ্ম শোষিতা ধরিত্রী, সর্বরিক্তা, শোষকের সামনে এসে দাঁড়ায় তার হিসাব নিকাশের দিনে। রাজার করুণ পরিণামে যে ফেটে পড়ে অট্টহাস্যে।"<sup>২</sup>

তিন অক্ষে বিস্তৃত যাত্রানাটকটির পটভূমি জম্বুদ্বীপ। প্রথম অক্ষের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় দেশের রাজা সংগ্রাম সিংহ চিন্তিত, কারণ জম্বুদ্বীপের একের পর এক উপনিবেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে। তাদের স্বাধীনতার মূলে আছে 'সাম্যবাদী' চেতনা, যার ফলে পণ্যের বাজার ক্রমশ ছোটো হয়ে যাচ্ছে। তারা আজ জম্বুদ্বীপের পুঁজির দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার সাহস দেখাচ্ছে। অথচ জম্বুদ্বীপে খাদ্য-বস্ত্রসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব মানুষের জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। দেশের উত্তর প্রান্তে দুর্ভিক্ষ ও পশ্চিমের বন্যা-মহামারি নিয়ে রাজার কোনো দুশ্চিন্তা নেই। কারণ দেশের অভাবকে বাঁচিয়ে রেখে বিদেশে পণ্য বিক্রি করায় মুনাফা বেশি। সংগ্রাম সিংহের অকপট স্বীকারোজি,

''বণিকের স্বার্থ আর রাজস্বার্থ

এই দুইয়ে ভেদ নাহি কিছু।

বণিকের স্বার্থরক্ষা হেতু

রাজরশ্মি ধরিয়াছি আমি।"°

বর্তমানে রাজার দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে ক্ষুদ্র উত্তরদ্বীপ। গত পাঁচবছর ধরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরেও তারা হার মানেনি। সেনাপতি অধীপ সিংহ জানান যে জম্বুদ্বীপ সেনার অস্ত্রের আঘাতে উত্তরদ্বীপকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয়েছে। নির্বিচার নরসংহারে দেশটিকে শবের স্তূপের উপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবুও দেশের নারী, বৃদ্ধ, শিশুরা দেশের প্রতি এক অদম্য ভালোবাসায় অবিরাম লড়ে যায়। শত্রুর জন্য একরাশ ঘৃণা নিয়ে তারা বলে, "আমার মাটির 'পরে দুশমনের স্থান নাই আর—।"

যুদ্ধক্লান্ত অধীপ সিংহ অবসর চায়। উত্তরদ্বীপের মানুমের মরণপণ সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা তার রক্তলোলুপ তরবারিকেও ভোঁতা করে দিয়েছে। মাতৃভূমির প্রতি তাদের আত্মত্যাগ দেখে তার চোখ শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে গেছে। কিন্তু রাজা সন্দেহ করেন অধীপ সিংহ হয়তো শ্বেতদ্বীপ দ্বারা প্ররোচিত হয়ে দেশদ্রোহিতা করবে। তাই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ চিনতে পেরে অধীপ সিংহ রাজাকে সাবধান করে দিয়ে যায়,

''আমি অপরাধী'—তবে রাজা

তুমি তার শান্তিদাতা নও। শান্তি দেবে যারা

তোমার অলক্ষ্যে দেশে দেশে

প্রস্তুত হতেছে তারা। রচিতেছে কাঠগড়া

আসামীর, তোমার—আমার।"<sup>8</sup>

নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে 'শোষিতা ধরিত্রী'র প্রতীক পদ্মর সুখী সংসারে যুদ্ধের সর্বনাশ আবার গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসে। গত যুদ্ধে গ্রামের বহু মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল, অনাহার-দুর্ভিক্ষে গ্রামকে গ্রাম শ্মশান হয়ে গিয়েছিল। এবারও রাজা আদেশ জারি করেছে আসন্ন যুদ্ধের জন্য সমস্ত ধান বাজেয়াগু করা হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 'পোড়ামাটির নীতি'র ফলশ্রুতিতে দুর্ভিক্ষের অনুষঙ্গ এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু জনতার নেতা পুণ্ডরীক তাদের শিখিয়েছে,

"রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। এইত তো চিরকাল হয়ে এসেছে। আজকে আমাদের চোখ খুলেছে—বারে বারে আমরা এই উলুখাগড়ারাই বা মরব কেন? যুদ্ধ হতে আমরা দেব না।"<sup>৫</sup>

পুণ্ডরীক 'দেশের সম্পদের প্রতীক' অরুন্ধতীর ব্যর্থ প্রণয়ী। অরুন্ধতীর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে রাজা তাকে হরণ করে নিয়ে গেছে। পুণ্ডরীকের যুদ্ধহীন সাম্যবাদী সমাজের কামনা, পদ্মর প্রতি মমত্ব ও অরুন্ধতীর সঙ্গে তার আপাত অপূর্ণ প্রণয়কাহিনি তার প্রকৃত রাজনৈতিক পরিচয়কে প্রকাশ করে। কিন্তু দেশের জনতা আজও পুণ্ডরীকের কাজ্জিত সমাজের জন্য প্রস্তুত হতে শেখেনি। তাই রাজার বিরোধিতার জন্য পুণ্ডরীককে গ্রেপ্তার করা হলে ভীম, ম্যাথরা, মালেকরা প্রতিবাদে ফেটে পড়তে পারে না।

তৃতীয় দৃশ্যে রাজ অন্তঃপুরে রানি অরুন্ধতী রাজাকে অভিসম্পাত জানায়,

"লক্ষ লক্ষ উৎপীডিতের

ক্রোধের আগুনে... ভস্মসাৎ হবে একদিন—

দণ্ডগর্বী শয়তানের দণ্ডের মহিমা।"\*

অরুন্ধতী নিজেও রাজার দ্বারা উৎপীড়িতা। কিন্তু রাজ সিংহাসনের ছত্রছায়া তার স্বতন্ত্র সত্তাকে মুছে দিয়েছে। শুধু যন্ত্রণাদায়ক অতীতের স্মৃতিচারণা এবং মুক্ত ভবিষ্যতের কল্পনা ছাড়া তার কাছে আর কোনো রাস্তা নেই। পরাধীন জীবনে সে জেনেছে দেশপ্রেমের প্রকৃত মূল্য। সে বলে,

''শান্ত দেশবাসীগণে প্রজা অধিকারবোধে

সচেতন করা, তারই নাম দেশপ্রেম।"

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী রাজার কাছে অধিকার মানে শুধুই দাসত্বের শৃঙ্খল। বিশ্ববাসীর স্বাধীনতাকে গলা টিপে হত্যা করাই রাজার অধিকারবোধ। দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দেশবাসীর অন্ন কেড়ে নিয়ে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করাই তার কাছে অধিকার। তাই রাজা অরুন্ধতীর শরীর পেলেও মন জয় করতে পারে না। প্রতিশোধস্পৃহায় রাজা বন্দী পুণ্ডরীকের দণ্ডের বিচার অরুন্ধতীর উপর ছেড়ে দেয়।

নাটকের দ্বিতীয় অক্ষের প্রথম দৃশ্যে সমগ্র দেশের দারিদ্র্য-অন্নাভাবের ছবি ফুটে ওঠে। যুদ্ধের প্রয়োজনে ধান কেটে নিয়ে যাওয়ায় চাষিরা কর্মহীন হয়ে পড়েছে। ঠাকুরমশাই গানের ভাষায় জানান, যেভাবে মাছের জন্য টোপ গেঁথে ছিপ ফেলা হয়, তেমনই কৃত্রিম অন্নাভাব তৈরি হয় মানুষকে দিয়ে অমানুষের কাজ করানো হয়। পদ্মর স্বামী ভীম সেই ফাঁদে পা দিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভীমের সৈনিক বেশ দেখে পদ্মর মনে পড়ে ঠিক এই পোশাকের লোকেরাই তাদের জমির ধান কেটে নিয়ে গেছে। পদ্ম ভীমকে বোঝানোর চেষ্টা করে,

"যে রাজা তোমার মুখের গেরাস কেড়ে নে গেল—নিকোনো গোলায় আমার হাতে আঁকা আলপনা যার ঘোড়সোয়ারে তছনছ করে দে গেল—সেই রাজার হয়ে তুমি নড়াই করতে পারবে?"<sup>৮</sup>

কিন্তু পুঁজিবাদী চক্রান্তের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার ক্ষমতা আজকের ভীমের নেই। যে হাত একদিন ধান কাটত, সেই হাত আজকে চলেছে মানুষ কাটতে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে কারাবন্দী অধীপ সিংহ ও পুণ্ডরীকের সাক্ষাৎ হয়। পুণ্ডরীকের অপরাধ সে দেশের মানুষকে এক ক্ষুধাহীন, দারিদ্র্যহীন, হাহাকারহীন দেশের সন্ধান দেখাতে চেয়েছিল। অধীপ সিংহের অপরাধ সে বিদেশকে ভালোবেসেছিল। যুদ্ধের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে সে অনুভব করেছিল, "পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এক। তারা একই ক্ষুধায় কাতর—একই দারিদ্র্যে পিষ্ট।" অরুন্ধতী পুণ্ডরীকের মুক্তির ব্যবস্থা করলেও ভুলবশত অধীপ সিংহকে মুক্ত করা হয়। মুক্ত অধীপ সিংহের তখন একটাই দায়িত্ব— পুণ্ডরীকের অপূর্ণ কাজ সমাপ্ত করা।

চতুর্থ দৃশ্যে নির্বাসিত হত্যোদম পুগুরীক তার গ্রামে ফিরে আসে। সে আজ পরাজিত— সাম্রাজ্যবাদী রাজা নয়, তার পরাজয় ঘটেছে অরুন্ধতীর ব্যর্থ প্রণয়ের কাছে। অরুন্ধতীর যন্ত্রণা সে জানতে পারেনি, তার কাছে বড়ো হয়ে উঠেছিল পরাজয়ের হতাশা। কিন্তু লড়াইটা শুধু রানির অধিকার পাওয়ার নয়, লড়াইটা পদ্মর মতো দেশবাসীর সমানাধিকারের। যারা রানির অধিকারের জন্য লড়েছিল, তারা শেষ পর্যন্ত সর্বহারার একনায়কত্বের বদলে স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছিল। পদ্ম সে কথাই পুগুরীককে মনে করিয়ে দেয়,

"পুণ্ডরীক : রাজার হুকুমে হয়তো যেতাম না পদ্ম—কিন্তু এ যে রানির হুকুম। যে আমার বাল্যের সহচরী, যৌবনের স্বপ্ন—যাকে ঘিরে আমার সমস্ত উদ্যম, সমস্ত কামনা, সমস্ত কর্মশক্তি—এ তারই হুকুম।... চোখের সামনে সব আলো যখন নিভে যায় পদ্ম—জীবনের লক্ষ্যটা হারিয়ে যায়।

পদ্ম : (তীব্রদৃষ্টিতে পুণ্ডরীকের দিকে তাকায়) ও—তাই! তোমার জীবনের লক্ষ্য ছেল অরুদিদি। তুমি ভালোবাসনি এ দেশকে—এ দেশের মাটিকে—এ দেশের মানুষকে। ঐ অরুদিদির তরে তুমি রাজার সাথে নড়াই করেছেলে—ঐ অরুদিদির তরে আমাদের শিখ্যেছেলে রাজার আইন না মানতে। সারাদেশের মানুষের ভালোবাসার চেয়ে তোমার কাছে বড় হল অরুদিদির ভালোবাসা—তবে তুমি মিথ্যুক—তুমি আমাদের ঠক্যেছিলে—"<sup>»</sup>

নেতৃত্বের অহংকারে পুণ্ডরীক টের পায়নি জনতার শক্তি তাকে ফেলে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। সে নিমিত্ত মাত্র, জনতা তার নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে। নাটককার এখানে সারাবিশ্বের নেতৃত্বের জন্য এক সাবধানবাণী রেখে যান।

চতুর্থ অক্ষের প্রথম দৃশ্যে রাজা পীতদ্বীপ আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৫০-৫৩ এই সময়কালে কোরিয়ার বিবাদে আমেরিকা ও চিনও জড়িয়ে পড়ে। ইউনাইটেড ন্যাশনের অধীনস্থ আমেরিকান সৈন্যদল ম্যাকার্থির নেতৃত্বে উত্তর কোরিয়ার দখলীকৃত জমি উদ্ধার করে চিন সীমান্তে ঢুকে পড়ে। আনুমানিক দু'লক্ষ চৈনিক সৈন্য মারা যায় এবং অসংখ্য সৈন্যকে বন্দী করা হয়।<sup>১০</sup> এমনকি একটা

সময়ে নিউক্লিয়ার বিক্ষোরণের পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছিল। বাস্তবে যা ঘটেনি, নাটকে সেই ঘটনাই সত্যি হয়ে দেখা দেয়। জম্বুদ্বীপের লক্ষ লক্ষ কৃষক রাজধানী ঘিরে ফেলে রাজার যুদ্ধনীতি ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করে। রাজার শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার অন্দরেও নীরব প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। প্রধান অমাত্য ও সেনাপতি রাজার থেকে দূরে সরে যায়। সাম্রাজ্যবাদ কাউকে কখনও ভালোবাসে না, ভালোবাসা তার রক্তে নেই। অরুন্ধতীকে 'পিশাচিনী' সম্বোধন করে রাজা তার প্রকৃত চরিত্রের পরিচয় দেয়। একলা, ক্লান্ত রাজা অরুন্ধতীর থেকে প্রত্যাঘাত ভিন্ন কিছু পায় না। ততক্ষণে দেওয়াল-লিখনের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে,

"আজ বুঝি সমাগত সে উত্তরের দিন

উৎসবের সমারোহ,—সাজে—

দেখিছেন মহারাজ, দশদিক আলো করি

বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টিকা?"<sup>১১</sup>

দ্বিতীয় দৃশ্যে ভীম ফিরে আসে যুদ্ধ থেকে। তার সারা মুখ বীভৎসভাবে জ্বলে গেছে; যুদ্ধের ভয়ংকরতার যথার্থ প্রতিচ্ছবি তার শরীর জুড়ে। সে বলে,

"ভাই—আমি তোমাদের দেখতে পাচ্ছি নি। তেবু বলি—নড়াইয়ে কেউ যেওনি—পেটের জ্বালায় আমি গেছনু। আমারে যেখানে নে গেছলো সে দেশ কখনও দেখিনি—এরা বলে সে নাকি কসায়ের দেশ, কিন্তুন সেখানে গে দেখি তারা আমাদেরই মতো কিষাণ—যারে বাণ মারতে বললে তারে দেখে মনে পড়ল আমার ভোলার মুখখানা—হাতটা কেঁপে গেল;— আর সেই সময় ওদের আগুন বাণের গোলায় আমার মুখখানা পুড়ে গেল—বড় কষ্ট ভাই— বড় কষ্ট! যেওনি, তোমরা কেউ যুদ্ধে যেওনি!"<sup>১২</sup>

তৃতীয় দৃশ্যে আত্মগ্লানিতে দীর্ণ অরুন্ধতী আত্মহত্যা করতে চাইলে পুণ্ডরীক তাকে বাঁচায়। চতুর্থ দৃশ্যে সেনাপতি ও প্রধান অমাত্য যৌথস্বরে যুদ্ধশেষের বাণী ঘোষণা করেন। অরুন্ধতীর পিতা

উন্মাদ গায়ক ঠাকুরমশাইকে রাজা বন্দী করে রাখলেও তার কণ্ঠকে বন্দী করতে পারেনি। সারা জম্বুদ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছিল তার গান, "মানুষের ভগবান জাগছে"। সেই সুরে বলীয়ান হয়ে সাধারণ জনতা রাজপ্রাসাদ দখল করে নেয়। রাজার আণবিক বোমার ব্যর্থ আক্ষালন চাপা পড়ে যায় মানুষের বিদ্রোহী কলরবে। পুগুরীক-অরুন্ধতীর মিলনের পর থাকে শুধু একটাই দ্বন্দ্ব। সাম্রাজ্যবাদী রাজা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে সর্বরিক্তা ধরিত্রী পদ্মর মুখোমুখি সংঘাত। অসহায় রাজার পালিয়ে যাওয়া ছাড়া গতি থাকে না। প্রতিষ্ঠিত হয় জনগণের রাজত্ব। যে রাজত্বে আর কোনো ভীমকে যুদ্ধে গিয়ে পঙ্গু হতে হয় না, যেখানে অরুন্ধতীকে বন্দী হয়ে থাকতে হয় না, যেখানে মাঠভেরা পাকা ধানের সারি। নেপথ্যে ক্রমশ জোরালো হতে থাকে ঠাকুরমশাইয়ের গান, "মানুষের ভগবান জাগছে"।

নাটককার বীরু মুখোপাধ্যায় চরিত্রনির্মাণে রূপকের তত্ত্ব এবং ব্যক্তিসন্তার সার্থক মিশেল ঘটিয়েছেন। রাজা সংগ্রাম সিংহের হিংস্র রক্তলোলুপতা থেকে অসহায় পলায়নের মধ্যে নাটককার যেমন সাম্রাজ্যবাদের পতনের বার্তা দিয়েছেন, তেমনই তার একাকীত্বের যন্ত্রণাও তুলে ধরেছেন। অরুদ্ধতীকে রাষ্ট্রব্যবস্থার নাগপাশে আবদ্ধ দেশের সম্পদ বলে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। আবার প্রথন্যীর শান্তিঘোষণা করে তাকে অন্তর্দ্বন্দে জর্জরিত হতে দেখি। পদ্ম সেই বাঙালি ঘরের রমণী, যাকে পঞ্চাশের মন্বন্তরে কোলের শিশুর জন্য কাঁদতে দেখা গেছে। আবার তাকেই দেখা গেছে তেভাগার দাবিতে উদ্যত কান্তে হাতে। যদিও পুগুরীক চরিত্রটিকে কর্তব্যসাধনের বাইরে নিম্প্রভ মনে হয়। গৌণ দুটি চরিত্র প্রধান অমাত্য ও মহাজন চৌধুরীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। আমলাতন্ত্রের প্রধান মুখ আমাত্যকে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মের আত্মা রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়ে নাটককার রাষ্ট্রশক্তির আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাকে গুরুত্বহীন করে দিয়েছেন। মহাজন চৌধুরী যুদ্ধের বাজারে মুনাফালাভ করার জন্য গুড় কিনে জমিয়ে রাখতে চেয়েছিল। এদের মতো কালোবাজারি ব্যবসাদারদের কারণেই পঞ্চাশের মন্বন্তর এত ভয়ানক আকার ধারণ করেছিল। 'খাদ্যসংকট'-এর পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি স্বাধীনতার পরেও ভূমিসংক্ষার বিলের ব্যর্থতোয় এরা বহাল তবিয়তে বিরাজ করছিল। অথচ মহাজন চৌধুরীই অভুক্ত ভোলাকে বাড়িতে ডেকে খাদ্যের ব্যবস্থা করে দেয়। তেভাগা

পরবর্তী সময়ে মজুতদার মহাজন জমিদার চৌধুরী এহেন আচরণ আশ্চর্যজনক। একইভাবে পুঁজিপতি উদ্ধব, সৈন্ধবদের কী পরিণতি হয়, সে ব্যাপারেও নাটককার নীরব।

বীরু মুখোপাধ্যায় নাটকটির আঙ্গিক রূপে যাত্রার ধরণ বেছে নিয়েছেন। তৎকালে যাত্রার মতো 'একটি লুপ্তপ্রায় লোক-আঙ্গিক'কে ব্যবহার করা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সেই বিষয়ে নাটককার জানাচ্ছেন,

"এরূপ একটি সর্বজনপ্রিয় লোক আঙ্গিকের মাধ্যমে যদি আধুনিক একটি বলিষ্ঠতম ভাববাদকে শৈল্পিক উৎকর্ষতার সাহায্যে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা যায়, তাহলে নবনাট্য আন্দোলনের একটি বন্ধ দুয়ার উন্মুক্ত হবে, এই বিশ্বাসই আমার রাহুমুক্ত রচনার প্রেরণা। ফল কি হয়েছে তার বিচারক জনসাধারণ।"<sup>20</sup>

নাটককারের উদ্দেশ্য প্রশ্নাতীতভাবে সফল হয়েছিল। বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপট, রূপকধর্মিতা, মার্কসীয় তত্ত্বের গভীরতা সত্ত্বেও জনসাধারণ যাত্রানাটকটিকে বিপুল আতিথেয়তার সঙ্গে বরণ করে নিয়েছিল। গণনাট্য সংঘ তারপরেও কেন যাত্রা বা লোকনাট্যের আঙ্গিককে ব্যাপক মাত্রায় ব্যবহার করতে পারেনি সেটাই আশ্চর্যের।

#### সমাজবদলের নাটক—'সংক্রান্তি' :

ইংরেজ আসার আগে ভারতের শাসনকাঠামো ছিল সামন্ততান্ত্রিক। বণিকের ছদ্মবেশে আগত ইংরেজ অতি দ্রুত ভারতবর্ষকে পুঁজিবাদের দাস করে তোলে। ভারত তখন শুধু আর বৃহৎ পুঁজির বাজার নয়, পুঁজির মূল উৎসস্থলও বটে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সামন্তপ্রভুরা হয়ে উঠল রক্তশোষক জমিদার। অন্যদিকে নগরসভ্যতা গড়ে উঠল ভারতীয় সম্পদের বর্হিনির্গমনের মূল চালিকাশক্তি রূপে। যার সঙ্গে লড়াই করতে না পেরে দেশীয় কুটিরশিল্প ক্রমশ হারিয়ে যেতে শুরু করে। জমি-জীবিকা

হারিয়ে গ্রামীণ কৃষক হয়ে ওঠে কারখানার দিনমজুর। ক্রমশ ভারতবর্ষ এক আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থার রূপ পরিবর্তনের সার্বিক প্রেক্ষাপটকে বীরু মুখোপাধ্যায় 'সংক্রান্তি' নাটকে তুলে ধরেছেন। শুধুমাত্র আর্থসামাজিক রূপ বদল নয়, তার সঙ্গে মানবচরিত্র পরিবর্তনের বিস্তৃত ধারাপাত নাটকটিতে তুলে ধরা হয়েছে। তিনটি অঙ্কে বিন্যন্ত নাটকটির সূত্রপাত ঘটে উনিশ শতকের শেষ দশকে দত্তপুর গ্রামে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে যে গ্রামের নাম ছিল সোনার গাঁ। গ্রামের জমিদারি দেখাশোনা করেন মদ্যপ, উচ্ছুঙ্খল হর্ষনারায়ণ দত্তের বিধবা মা নিস্তারিণী দেবী। জমিদার বংশের হর্ষ ও চাকর রতনের ছেলে একই সময়ে জন্মগ্রহণ করে। পণ্ডিতমশাই চন্দ্রমাধববাবু ভবিষ্যৎবাণী করেন হর্ষর ছেলে আদিত্যর ঘোড়াশালে ঘোড়া আর হাতিশালে হাতি হবে। কিন্তু রতনের সন্তান বড়োজোর জমিদারের পাইক হবে। কারণ ক্ষেত্র আলাদা! এই ক্ষেত্র ঠিকুজি-কুর্চ্চি, গ্রহ-তারার ক্ষেত্র নয়; এই ক্ষেত্র অর্থবৈষম্য ও সামাজিক প্রতিপত্তির বৈষম্য।

যে বৈষম্যের জন্য জমি শুধু বাপের নয়, দাপেরও। সমাজের আর্থিক অধিকর্তা হয়ে ওঠার পাশাপাশি তাদের অঙ্গুরিহেলনে নিয়ন্ত্রিত হয় ধর্ম, সংস্কার, আচারবিচার। তাই নমঃশূদ্র চাষি সয়ারাম, সনাতনদের মন্দিরের পাশের জমি থেকে উৎখাত করা হয়। 'যোশেফ' সয়ারামরা 'খ্রিস্টান' হয়ে সামাজিক সংস্কার থেকে মুক্তি পেয়েছিল, সাহস করে বলেছিল তারা আর 'ব্যাগারের বাজনা' বাজাবে না। দত্তপুরের জমিদারতন্ত্রের ইতিহাসে প্রথমবার তারা জমি-সমস্যা সমাধানের জন্য কাছারিতে না এসে আদালতের দারস্থ হয়েছিল। কিন্তু তাদের অজানা ছিল যে আইনপ্রণেতা ইংরেজই সামন্ততন্ত্রের সবথেকে বড়ো পৃষ্ঠপোষক। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তাদের পিঠে গেঁথে দিয়েছিল চাবুকের রক্তাক্ত আঘাত আর ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রের জাঁতাকলে তাদের সর্বস্বান্ত হতে হল।

জমিদারবংশের সদ্যোজাত সন্তানের মায়ের মৃত্যুর গোলযোগের পরিবেশে রতন নিজের সন্তানকে রেখে এসেছিল দত্তবাড়িতে। আর হর্ষনারায়ণের সন্তানকে নিজের ঘরে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু হর্ষনারায়ণের 'রক্তের দোষে' রতনের সন্তান হয়ে গেল পঙ্গু। চোখের সামনে পঙ্গু ছেলেটিকে

দেখে রতন ক্রমশ বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে, অসুস্থ স্ত্রী দুর্গা তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে। অন্যদিকে রতনের রক্তের সন্তান আদিত্য স্নেহহীন, ভালোবাসাহীন দত্তবাড়ির বিলাস-বৈভবের মধ্যে বড়ো হতে থাকে। জন্মের সময় সে তার মাকে হারিয়েছে, বাবা মদ্যপ, অভিমানী ঠাকুমা কাশীবাসী। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী ভবিতব্য এক সমান্তরাল সময়রেখায় এগোতে থাকে।

কিন্তু যুগ পরিবর্তনের লিখন পড়ার সাধ্য রতনের ছিল না। হর্ষর ছেলের 'রক্তের দোষ' শুধু শারীরিক ব্যাধি নয়, যুগ যুগ ধরে বাংলার জমিদার বংশগুলি সাধারণ মানুষের উপর যে অত্যাচার করে এসেছে, এই ব্যাধি তার সমাপ্তির লক্ষণ। তাই যোশেফ সয়ারামরা অনায়াসে জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে মামলা করার সাহস পায়। বৈবাহিক জীবনের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ঠাকুরমশাইয়ের মেয়ে পারুল পরপুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যায়। রক্ষণশীল বাঙালি সমাজের প্রতিটি ঘরে ঝড়ের তাণ্ডবনৃত্য শুরু হয়। যে ঠাকুরমশাই একদিন গর্ব করে হিন্দুধর্মের বর্ণাশ্রমকে সমর্থন জানিয়েছিলেন, আজ 'একঘরে' হয়ে তিনি রতনের হাত ধরে উঠে দাঁড়ান। অশক্ত কণ্ঠে তিনি বলে ওঠেন,

"সব দুলছে—বুঝতে পারছিস না—এই বাড়ি, ঘর, পৃথিবী সংসার—সব দুলছে—শক্ত হাতে ধরে রাখ—নইলে সব ভেঙে পড়বে—তোর খুব শক্ত হাত, বাঃ—তোর খুব শক্ত হাত— খুব শক্ত—"<sup>58</sup>

নিজের অজান্তেই ঠাকুরমশাই সমাজ পরিবর্তনের ব্যাটনটা তুলে দেন রতনের হাতে। পূর্বপুরুষের অধিকারসূত্রে যার দায়িত্ব এসে পড়ে আদিত্যর কাঁধে।

এরপর নাটকের কাহিনি এগিয়ে যায় পনেরো বছর। দত্তপুরের কৃষিজমিতে এখন কারখানা বসেছে। খাজনা ও অন্যান্য বাজে আদায়ে নিঃস্ব চাষিরা এখন কারখানার ঘানি টানে। খ্রিস্টান সয়ারাম, সনাতন, হিন্দিভাষী গোঁড়া সংস্কারপন্থী শুক্কুররা একই সঙ্গে কাজ করে। দত্তবংশের পূর্বতন নায়েব এখন শ্রমিক বস্তিতে চা বিক্রি করেন। যে রমাই পণ্ডিত একদিন জমিদারবাড়ির কাপড় বানানোর অহংকারে রতনের ছেলের কাপড় তৈরি করতে রাজি হয়নি, আজ কারখানার অভিশাপে সে রাস্তায়

নেমে স্বদেশি কাপড়ের গুণগান করে। বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মজুরদের এক মিশ্র সংস্কৃতি তৈরি হয় শ্রমিক-বস্তিতে। সনাতনের মুখে শোনা যায় পুঁজিবাদের বিরাট ঘানিতে পিষে যাওয়ার যন্ত্রণা,

"এখন মনে হয় আগেই ছিলুম বুঝি ভাল, বুঝলি? নিজের ক্ষেত যখন ইচ্ছে যাচ্ছি, যখন ইচ্ছে আসছি, এ শালা ঘড়ি ধরে সকাল আটটা থেকে রাত আটটা—"<sup>১৫</sup>

নাটকে পুঁজিবাদের প্রধান প্রতিনিধি কারখানার মালিক কালীনারায়ণের বিলেতফেরত পুত্র শঙ্কর। শঙ্করের কারখানা তার পিতার জমিদারিতে হস্তক্ষেপ করলে শুরু হয় পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব শুধু পারিবারিক বা জমির মালিকানার দ্বন্দ্ব নয়; এই দ্বন্দ্ব দুটি ভিন্ন সমাজব্যবস্থার দ্বন্দ্ব। একদিকে ক্রমক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের চিরকালীন প্রতাপশালী ঔদ্ধত্য ও গোঁড়ামি, অন্যদিকে নব্য পুঁজিবাদী সভ্যতার আগ্রাসী উচ্চাকাজ্জা। পতন সুনিশ্চিত জেনে কালীনারায়ণ অসহায় কণ্ঠে বলে যান,

"গা শুদ্ধ ক্ষেতী প্রজাদের কলে ঢুকিয়েছ কুলি করে। আমার ধান কাটার জন্যে সাঁওতাল আনতে হয় বীরভূম থেকে, তবু কিছু বলিনি—জানি পেটের জ্বালায় গেছে—পালে পার্বণে একটা ব্যাগারের লোক পাই না। আমার খাসের প্রজা পাশ দিয়ে গেলে হাত তুলে একটা প্রণাম পর্যন্ত করে না—সব সহ্য করেছি! কিন্তু আমার বাপ-পিতামোর সাধের পুকুরপাড়ে তুমি কলের কুলি বসাবে—এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না।"<sup>26</sup>

কালীনারায়ণ জানতেন না যে পুঁজিবাদে আপনজন বলে কেউ থাকতে পারে না। সামন্ততন্ত্রের সামাজিক ভেদাভেদের জায়গা দখল করে আর্থিক বৈষম্য। মানুষের ব্যক্তি মূল্যের থেকেও বেশি প্রয়োজনীয় তার শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্য। পারিপার্শ্বিক বুর্জোয়া রাজনীতিকেও পুঁজিবাদ আপন স্বার্থে ব্যবহার করে। যদিও তখন বিদেশি বস্ত্র পোড়ানোর উন্মাদনা এবং 'বন্দেমাতরম', 'Boycott British Goods'-এর চিৎকারে আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠেছিল।

এ-কথা ঠিক যে সাধারণ জনতার দেশের প্রতি ভালোবাসা বা ইংরেজ-বিরোধী উন্মাদনায় কোনো খাদ ছিল না। দেশীয় নেতারা নিজের ও দলের স্বার্থে এদের সমর্থন জানিয়েছিল। শিল্পপতি শঙ্কর নিজের কারখানার ব্যবসা বাড়ানোর জন্য বিদেশি বস্ত্র পোড়ানোকে সমর্থন করে। সে বিরাট

অক্ষের কালোটাকার আইনি ফাঁদ থেকে বাঁচার জন্য হাসপাতাল বানায়। এইসব দেখে দেশের যুবসমাজের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার ঘটে, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে। আদিত্য বংশমর্যাদায় দত্তবাড়ির সন্তান হলেও আদতে সে রতনের সন্তান। রক্তের ডাক সে অস্বীকার করবে কী করে? যার কপালে লেখা ছিল 'হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া', সে স্বদেশি আন্দোলন থেকে সরে এসে সশস্ত্র বিপ্লবীদের দলে যুক্ত হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ তাকে দশবছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।

তৃতীয় অক্ষে আদিত্য যখন দশবছর পরে ফিরে আসে তখন আর দত্তপুর গ্রাম নেই, এখন তার নতুন নাম শঙ্করনগর। দেশীয় রাজনীতিতেও দুটি নতুন জিনিসের আবির্ভাব ঘটেছে—চরকা ও শ্রমিক অসন্তোষ। শঙ্করের মতো পুঁজিপতিরা চরকাকে ভয় পায় না। তার কারখানার মস্ত বড়ো বয়লারে হাজারো হাজারো মানুষের রক্ত জল করা পরিশ্রম কালো ধোঁয়া হয়ে মিশে যাচ্ছে আকাশে। এক দানবীয় যন্ত্রের মারণফাঁদে তৈরি হচ্ছে বিশ্বজয়ের চাবিকাঠি। সমগ্র ভারতবর্ষ একসঙ্গে চরকা চালালেও যার শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে পারবে না। শঙ্করের আশঙ্কা শ্রমিকদের কালো কালো হাতগুলি নিয়ে। যদি কোনোদিন সেই হাতগুলি কারখানার মেশিন থেকে সরে গিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে মালিকের দিকে এগিয়ে আসে। সে বলে,

"ভয় আমার ঐত্থানে, চরকা শত্রু নয়, শত্রু আমার ঐত্থানে—ঐ মিশকালো ধোঁয়ার নিচে বিরাট বয়লার, তার নিচে আগুন, তার নিচে হাত—অসংখ্য কালো কালো পেশিবহুল হাত,

একজোটে কাজ করে চলছে—ভয় আমার ঐখানে।"<sup>১৭</sup>

শঙ্করের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। কারণ বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই দেশীয় কারখানাগুলিতে শ্রমিক আন্দোলন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তথাকথিত বামপন্থী শক্তিগুলির জন্ম না হলেও ১৯২০ সালে লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সূত্র ধরেই সয়ারাম, শুক্কুর, সনাতনরা মালিকের কাছে গিয়ে স্পষ্টভাষায় বলে,

"নাটমন্দিরের ধারে ঘর ছিল, উচ্ছেদ হয়েছিলুম জাতের দায়ে। মামলা করেও ফল হয়নি। জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছি পেটের দায়ে, বাকি আছে শুধু গতরটা, সেটা থেকে উচ্ছেদ হওয়ার আগে—সবাই মিলে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব বই কি স্যার—"<sup>১৮</sup>

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করার শক্তি অর্জন করতে পারেনি, কিন্তু পুঁজিবাদ তাদের সেই শক্তি দিয়েছে। এখানে কার্ল মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তত্ত্বকে নাটককার অতি সূক্ষ্মভাবে চালনা করেন। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী প্রাচীন গ্রামসমাজ ভেঙে ভারতবর্ষকে আধা-পুঁজিবাদী দেশ হয়ে উঠতে দেখে মার্কস বলেছিলেন,

"England, it is true, in causing a social revolution in Hindostan, was actuated only by the vilest interests, and was stupid in her manner of enforcing them. But that is not the question. The question is, can mankind fulfil its destiny without a fundamental revolution in the social state of Asia? If not, whatever may have been the crimes of England she was the unconscious tool of history in bringing about that revolution."<sup>>b</sup>

প্রাচীন সমাজের জড়তা ভেঙে পুঁজিবাদের অন্ধকারার মধ্যে দিয়েই যে শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব আসবে সে ব্যাপারেই মার্কস নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। ফলে নাটকের সময়কালের দ্বন্দ্ব চরকা বনাম যন্ত্র নয়, এক অনাগত ভবিষ্যতের পূর্বে যুগসন্ধির দ্বন্দ্ব। চরকাকে জাতীয় রাজনীতির 'প্রতীক' করে দেশীয় নেতারা শুধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপে ভুল করেননি, বরং সামাজিকভাবেও মানুষের শক্তিকে খর্ব করে রেখেছিলেন।

একদিকে যেমন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকা শ্রমিক অসন্তোষ, অন্যদিকে কালীনারায়ণের জমিদারি অপবুদ্ধির মাশুল গুণতে হয় শঙ্করকে। মদ্যপ হর্ষনারায়ণকে বোকা বানিয়ে কালীনারায়ণ খুব কমদামে দত্তবংশের জমিদারি কিনে নিয়েছিলেন। সেই জমিতেই গড়ে উঠেছে শঙ্করের বিরাট

কারখানা। কারখানার কারণেই সম্পত্তির মূল্য প্রায় ছয় গুণ বেড়ে গেছে। বর্তমানে নিস্তারিণী দেবী কাশী থেকে ফিরে এসে মামলা করতে প্রস্তুত হয়েছেন। আদিত্যরও জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। নাটকের চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্সে এসে রতন নিস্তারিণী দেবী, চন্দ্রমাধববাবু ও সীতার সামনে আদিত্যর জন্মবৃত্তান্ত ফাঁস করে দেয়। তার উরসজাত সন্তান আজ শুধু 'হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া'র মালিক নয়, দেশপ্রেমী রূপে দেশের মানুষের নয়নমণি হয়ে ফিরে আসছে। দৈবফলকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের অমোঘ ঐতিহাসিক নিয়মের জয় ঘোষিত হয়। আজকের নতুন যুগের 'জনমনগণ অধিনায়ক' জমিদার বংশ থেকে উঠে আসবে না, তার জন্ম হবে রতনের ভাঙা কুঁড়েঘরে।

আদিত্যর জন্মরহস্য জমিদারির শরিকী বিবাদের মুখ ঘুরিয়ে দেয়। শঙ্কর আমলা ও মামলার সাহায্য নিয়ে রতনের মুখ দিয়ে কোর্টে ছেলেবদলের ঘটনা তুলে ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু কালীবাবুর চাবুকের আঘাতে রতনের মৃত্যু ঘটে। আদিত্য জীবনে কখনও মায়ের ভালোবাসা পায়নি, এত কাছে থাকা সত্ত্বেও সত্যিকারের পিতার স্নেহ পায়নি। আজ বংশমর্যাদা ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়ায় ঠাকুমাও পর হয়ে গেছেন। সীতা তাকে বোঝায় 'দত্তবাড়ির ছেলে' পরিচয়টুকুর থেকেও অনেক বড়ো কৃতিত্বের জন্য তার জীবন। নিস্তারিণী দেবীও বংশমর্যাদার মিথ্যা গরিমাকে অস্বীকার করে আদিত্যকে বুকে টেনে নেন।

নাটককার নাটকের প্রতিটি চরিত্রকে সমাজব্যবস্থার বদলের স্রোতধারায় ভাসিয়ে দিয়েছেন। নিস্তারিণী দেবী বা কালীনারায়ণবাবুর মতো সামন্ততন্ত্রের ধ্বজাধারীরা কিছুতেই তাদের বংশগৌরবের অহংকার ত্যাগ করে সমাজ বদলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন না। সামান্য আঘাতেই নিস্তারিণী মা-মরা আদিত্যকে ফেলে কাশীবাসের সিদ্ধান্ত নেন। আর চূড়ান্ত বিপদের দিনেও কালীনারায়ণবাবু রতনকে চাকরজ্ঞানে চাবুক মারেন। জমিদারতন্ত্রের আশ্রিত নায়েব বা ঠাকুরমশাইয়ের মধ্যে ভবিষ্যতের 'পেটিবুর্জোয়া'-র বহুমুখী চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সহাবস্থান ঘটে। একসময়ের প্রভাবশালী নায়েব এখন চায়ের দোকানের আড়ালে মদের ব্যবসা চালাতে চান। একঘরে হয়ে যাওয়া ঠাকুরমশাই নানা তীর্থস্থান ঘুরে জীবনের সারসত্য স্বীকার করে নেন। আবার সয়ারাম, সনাতনদের একটাই ধর্ম—

তারা চিরকালের সর্বহারা। কখনও জাতের জন্য উচ্ছেদ হয়ে, কখনও বা প্রাপ্য আদায়ের জন্য মালিকের রোষদৃষ্টিতে পড়ে তারা এক গভীর সত্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

গ্রামসমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন চাকর রতন তার ক্ষুদ্র স্বার্থলোলুপ বুদ্ধিবলে এই বৃহৎ সামাজিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়তে চেয়েছিল। কোনো মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নয়, দৈবের লিখনকে ধ্রুবক কল্পনা করে সে পরের প্রজন্মের ভাগ্যরচনা করতে চেয়েছিল। কিন্তু অন্ধকারে লোলুপ রতনের চোখদুটি দেখে ভবিতব্য সেদিন একটু মুচকি হেসেছিল। রতনের অন্ধ কুসংস্কার ইতিহাসের নিয়ম বদলাতে পারেনি, কিন্তু তার রচিত নাটকে সে নিজেই ট্র্যাজিক হিরো হয়ে যায়। তুলনায় আদিত্য চরিত্রটি যথোপযুক্ত বিস্তার লাভ করে না। আজীবন স্নেহহীন সদ্যযুবক আদিত্য কোন সৎসাহসে সর্বস্ব ত্যাগ করে রতনকে পিতা বলে মেনে নেয়, তার কারণ নাটকে অনুল্লেখিত রয়ে গেছে।

নাটকটি সমকালে যথেষ্ট জনপ্রিয় হলেও সাধারণ দর্শক দিনবদলের চেতনার স্বর্নপটি স্পষ্ট বুঝতে পারেনি। তাদের কাছে নাটকটির ছেলে-বদলের কাহিনিই মুখ্য হয়ে উঠেছিল।<sup>২০</sup> নাটকটির বিস্তৃত পরিসর শেষ হয়েছে পারিবারিক মেলোড্রামায়। পিতৃপরিচয় আবিষ্কার করার পর আদিত্যর মধ্যে নতুন রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভবের পরিস্থিতি নাটককার তৈরি করেননি। সময়ের ঐক্যকে বিচ্ছিন্ন করে নাটককার ইতিহাসের এমন এক কালখণ্ডে নাটকটি সমাপ্ত করেছেন, যে সময়ে গান্ধীজির উত্থান ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন ধারাপাত সৃষ্টি করবে। ফলত যে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নাটকের সূত্রপাত, তাত্ত্বিকভাবে তা সমাপ্তিলাভ করেনি।

## তথ্যসূত্র :

১। ভানুদেব দত্ত; অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাংলা প্রেক্ষাপট : ভারত, মনীষা, ২০১৫, পৃ- ১২৪ ২। বীরু মুখোপাধ্যায়; রাহুমুক্ত, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, তৃতীয় সং, বৈশাখ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, কৈফিয়ত ৩। তদেব, পৃ- ১২

৪। তদেব, পৃ- ১৯

- ৫। তদেব, পৃ- ২৯
- ৬। তদেব, পৃ- ৩৭
- ৭। তদেব, পৃ- ৪০
- ৮। তদেব, পৃ- ৫৪
- ৯। তদেব, পৃ- ৮২-৮৩
- **So** https://en.wikipedia.org/wiki/Korean\_War
- ১১। প্রাগুক্ত, রাহ্তমুক্ত, পৃ- ৯৪
- ১২। তদেব, পৃ- ৯৯
- ১৩। তদেব, কৈফিয়ত
- ১৪। বীরু মুখোপাধ্যায়; সংক্রান্তি, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, অষ্টম সং, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, পৃ- ৪১
- ১৫। তদেব, পৃ- ৬১
- ১৬। তদেব, পৃ- ৫৫
- ১৭। তদেব, পৃ- ৭৩
- ১৮। তদেব, পৃ- ৭৭
- کھ Karl Marx; The British Rule in India, Karl Marx and Frederick Engels Selected Works, Volume 1, Progress Publishers, Moscow, second edition 1973, p- 493
- ২০। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়; গণনাট্য সংঘের কটি বিশেষ প্রযোজনা প্রসঙ্গে, গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, (সম্পাদনা- বাবলু দাশগুপ্ত ও শিবশর্মা) গণনাট্য সংঘ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃ- ১৭২

## তালিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ: দুর্ভিক্ষ, খাদ্যসংকট, খাদ্য আন্দোলন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক

নাটক	নাটককার	প্রযোজনা সাল
আগুন	বিজন ভট্টাচার্য	১৯৪৩
জবানবন্দী	বিজন ভট্টাচার্য	১৯৪৩
নবান্ন	বিজন ভট্টাচার্য	<b>\$</b> 88
বিচার	পানু পাল	১৯৫৮
কত ধানে কত চাল	পানু পাল	১৯৫৯
শিবঠাকুরের দেশে	অমর গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৬৪
আত্মহত্যা আইনি কর	শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৬৪
অন্নপূর্ণার দেশে	শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৬৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সাম্প্রদায়িকতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু পরিস্থিতি এবং গণনাট্য সংঘের নাটক

নাটক	নাটককার	প্রযোজনা সাল
হোমিওপ্যাথি	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	\$\$88
নবান্ন	বিজন ভট্টাচার্য	\$\$88
বাস্তুভিটা	দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৪৮
দলিল	ঋত্বিক ঘটক	১৯৫৩
মশাল	দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫৪
বাংলার মাটি	তুলসী লাহিড়ী	ንንቆር
উজানযাত্রা	বিধায়ক ভট্টাচার্য	১৯৬২
দ্বীপ	উৎপল দত্ত	১৯৬৪

নাটক	নাটককার	প্রযোজনা সাল
পনেরোই আগস্টের পর	সজল রায়চৌধুরী	ንቃ8ዮ
ভাঙা বন্দর	পানু পাল	১৯৫১
ভোটের ভেট	পানু পাল	১৯৫১
গোলটেবিল	দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫৩
মালাবদল	সুনীল দত্ত	১৯৫৬
শুভদৃষ্টি	সুনীল দত্ত	১৯৫৬
আজব দেশ	মন্মথ রায়	ንቃራኦ
দাও ফিরে সে অরণ্য	চিত্তরঞ্জন ঘোষ	১৯৬০
সন্ত্রাস	চিররঞ্জন দাস	১৯৬৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: রাষ্ট্র, রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: গণনাট্য সংঘের নাটকে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ

নাটক	নাটককার	প্রযোজনা সাল
বিশে জুন	বীরু মুখোপাধ্যায়	ንቃራ8
মৃত্যুহীন	চিররঞ্জন দাস	১৯৬৫
ভিয়েতনাম	চিররঞ্জন দাস	১৯৬৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: গণনাট্য সংঘের নাটকে অন্যান্য প্রসঙ্গ

নাটক	নাটককার	প্রযোজনা সাল
রাহুমুক্ত	বীরু মুখোপাধ্যায়	ን୭৫৪
সংক্রান্তি	বীরু মুখোপাধ্যায়	ን୭৫৭